Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছমা বেগম

রোলঃ 227021407228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও আমাদের জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছমা বেগম

রোলঃ 227021407228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও আমাদের জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আছমা বেগম, আইডিঃ 227021407228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও আমাদের জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Asma Begum

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আছমা বেগম

আইডিঃ 227021407228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ইসলাম:

ইসলাম (আরবি: الإسلام) শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ, শান্তি ও আল্লাহর আনুগত্য। ইসলাম (আরবি: إسلام, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ [আল্লাহর প্রতি] শব্দটি স-ল-ম (আরবি: س-ل-م) মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন। এই মূল ধাতু সাধারণত শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ধারণার সাথে সম্পর্কিত শব্দ গঠনে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকে বোঝায়।

ইসলামের অনুসারীকে মুসলিম (আরবি: مُسْلِم) বলা হয়। এটি একই মূল ধাতু থেকে গঠিত একটি সক্রিয় অংশ, যার অর্থ "আত্মসমর্পণকারী (আল্লাহর প্রতি)" বা "যে আত্মসমর্পণ করে (আল্লাহর প্রতি)"।

"মুসলিম" শব্দটি আরবি "মুসলিম" থেকে এসেছে, যার অর্থ "আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী"। ফারসি ভাষায় "ان" (আন্) যুক্ত করে "মুসলমান" (ফার্সি: مسلمان) শব্দটি গঠিত হয়েছে। মূলত এটি বহুবচন অর্থ বহন করে, তবে বাংলা ভাষায় "মুসলমান" শব্দটি একবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বহুবচন নির্দেশ করতে "মুসলমানরা" শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ, ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস (তাওহিদ) এবং তাঁর বিধান মেনে চলা। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত (ঐশ্বরিক নির্দেশনা) অনুসরণ করা। শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণে ভিত্তিশীল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম(সূরা আল ইমরান: ১৯)

ইসলাম ধর্ম আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। ইসলাম শুধুমাত্র মক্কা-মদিনা বা আরব দেশ ও জাতির জন্য নয় বরং ইসলাম বিশ্বের সকল বর্ণ, গোত্র, জাতি এবং ধনী-গরিব, সাদা-কালো ও আরব-অনারব সকল মানুষের জন্যই প্রেরিত ও একমাত্র মনোনীত ধর্ম।
ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে সুসমন্বিতভাবে পরিচালনা করে।

মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ যুগে-যুগে অনেক নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব এবং নিদর্শন প্রেরণ করেছেন।এটি একটি একত্ববাদী ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলো পবিত্র আল-কুরআন, যা স্বয়ং আল্লাহর বাণী; আর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ বলা হয় যা হাদিস নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে সমস্ত সুন্নাহই হাদিস, কিন্তু সমস্ত হাদিস সুন্নাহ নয়।
ইসলামের আগমন হয়েছে মানবকল্যাণে এবং মানবতার মুক্তি দিতে। মানবজীবনের সকল সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধানে।

আকিদা:

ইসলামের প্রতি বিশ্বাস ব্যবস্থাকে আকিদা বলা হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এটি শুধু ধর্মীয় ধারণা নয়, বরং একটি বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক ও জীবনঘনিষ্ঠ বিশ্বদর্শন।
"আকাইদ" শব্দটি আরবি "আকিদা" (عقيدة) থেকে এসেছে, যার অর্থ বিশ্বাস, নীতি বা মতবাদ ইসলামী ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস ও মৌলিক নীতিসমূহের সংকলন। এটি ঈমানের মূলনীতিসমূহ নিয়ে গঠিত, যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসের ভিত্তি।
ইসলামী পরিভাষায়: ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের সমষ্টি, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

আকিদার মূল বিষয়বস্তু:

ইসলামী আকিদা প্রধানত ৬টি মৌলিক বিশ্বাস (ঈমানের স্তম্ভ) নিয়ে গঠিত:
১. আল্লাহর প্রতি ঈমান
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান
৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান
৪. নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান
৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান
৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান

আকিদার গুরুত্ব:

এটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তি।
সঠিক আকাইদ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না।
ভ্রান্ত আকাইদ (বিদআত, শিরক) থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।
সঠিক ইসলামী আকীদা দিয়েই আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন এবং এটি কবুল করে নেয়াকে আবশ্যক করেছেন।
সুতরাং, আকিদা হলো ইসলামের চিন্তাগত ও বিশ্বাসগত কাঠামো, যা একজন মুসলিমের জীবনদর্শন ও আমলের ভিত্তি নির্ধারণ করে।

ঈমান:

ঈমান (আরবি: إِيمَان) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাস, স্বীকৃতি বা আস্থা স্থাপন। ইসলামী পরিভাষায় ঈমান হলো মুখে স্বীকার, অন্তরে বিশ্বাস এবং আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস ব্যবস্থা।

ঈমানের সংজ্ঞা:

১. মুখে স্বীকৃতি :
কালিমা শাহাদাত বা ঈমানের মৌলিক কথাগুলো সত্য বলে স্বীকার করা। যেমন:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّهِ

অর্থ:আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।

২. অন্তরে বিশ্বাস:
ঈমানের মূল ভিত্তি হলো হৃদয় দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। শুধু মুখে বলা যথেষ্ট নয়। যেমন: আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল, আখিরাত ও তাকদীরের প্রতি অকপটে বিশ্বাস রাখা।

৩. আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন:
বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করা। যেমন: সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত আদায় এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা।

রাসূল (সা.) বলেছেন:
ঈমান হলো ৭০-এর অধিক শাখা। সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। (সহীহ বুখারী)

১.আল্লাহর প্রতি ঈমান:
আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো ইসলামী বিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এটি শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁর একত্ব (তাওহীদ), গুণাবলী, অধিকার এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা:
ইসলামি শরিয়তে অসংখ্য দলিল আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত –

اَمۡ خُلِقُوۡا مِنۡ غَیۡرِ شَیۡءٍ اَمۡ هُمُ الۡخٰلِقُوۡنَ

অর্থ:তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (সূরা আত-তুর: ৩৫)

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য কুরআন যুক্তি উপস্থাপন করে:
সৃষ্টির মাধ্যমে: পৃথিবী, মহাকাশ, মানবদেহ—সবই একজন আল্লাহ তা'য়ালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
ফিতরাত (স্বভাবগত বিশ্বাস): প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করার সহজাত প্রবণতা রয়েছে।

আল্লাহর কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন:

এ বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব, একমাত্র প্রতিপালক। এ মহাবিশ্ব পরিচালনায় তাঁর আর কোনো অংশীদার বা সহযোগী নেই। রব বলা হয় তাঁকেই যিনি সৃষ্টি করেন, পরিচালনা করেন এবং মালিকানা যার জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মালিক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো বিশ্ব পরিচালকও নেই। তিনিই আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিন হতে বান্দার জন্য রিজিক প্রদান করেন। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না কেবল যাকে যতটুকু জ্ঞান দেওয়া হয়, সে ততটুকুই জানে।

আল্লাহই একমাত্র উপাস্য হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপন:

মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। উপাসনা প্রাপ্তিতে আর কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ اُولُوا الۡعِلۡمِ قَآئِمًۢا بِالۡقِسۡطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

অর্থ: আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; (একই সাক্ষ্য দেন) তিনি (আল্লাহ) ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮))

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল একটিই-'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই অথবা কেউ উপাসনার যোগ্য নেই।'

আল্লাহর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন:

আল্লাহ তা'আলার ওপর ইমানের আরও দাবি হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসুলের সুন্নতে সুন্নাহ'য় যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে নিঃসংকোচে মেনে নেওয়া। তাই আমরা আল্লাহর জন্য কেবলমাত্র সেই সব নাম ও সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করব, যা তিনি এবং তাঁর রাসুল (সা.) সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর যে সমস্ত সিফাত বা গুণ বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আল্লাহর গুণাবলিতে বিশ্বাস :

আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলি হল তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত চিরন্তন ও পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। এগুলোকে "আসমাউল হুসনা" বা (সুন্দরতম নামসমূহ) ও সিফাত (গুণাবলি) এর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-আসমাউল হুসনা:

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি সকল গুণের আধার। এমন কোনো উত্তম গুণ নেই যা তাঁর মাঝে নেই। তিনি যেমন অসীম তেমনি তাঁর গুণাবলিও অসীম। তাঁর প্রতিটি গুণের মহিমাজ্ঞাপক পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো তাঁর গুণবাচক নাম। আল কুরআনে এগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বা সুন্দরতম নামসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন –

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا-

অর্থ: 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সে নাম ধরেই ডাকো।' (সূরা আল-আ'রাফ: ১৮০)

আমরা আল্লাহর নামের মহিমা, পবিত্রতা ও প্রশংসাজ্ঞাপক নিরানব্বইটি আসমাউল হুসনা বা গুণবাচক নামের কথা জানি। আসলে আল্লাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। তবে তাঁর এ নিরানব্বইটি নাম বেশি প্রসিদ্ধ। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর এসব পবিত্র নামের উল্লেখ রয়েছে।

আল্লাহর গুণাবলিকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর গুণাবলি হলো তাঁর পবিত্র সত্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহর প্রতি ঈমান শুধু একটি ধারণা নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম। এই বিশ্বাসই মানুষকে শিরক, কুফর ও পাপ থেকে রক্ষা করে এবং সফলতার পথ দেখায়।

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান:
ইসলামের ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস। এটি শুধু তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করাই নয়, বরং তাদের গুণাবলী, দায়িত্ব ও আল্লাহর আনুগত্যে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা রাখা।

মালাইকা বা ফেরেশতাগণের পরিচয়:

'মালাইকা(الْمَلَائِكَ) শব্দটি আরবি। বাংলা ভাষায় এর অর্থ হিসেবে ফেরেশতা কথাটি ব্যবহৃত হয়; এটি মূলত ফার্সি ভাষার শব্দ। ফেরেশতাগণ আল্লাহর আজ্ঞাবহ জ্যোতির্ময় সত্তা। তাঁরা আল্লাহর বার্তাবাহক। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁরা নিষ্পাপ ও পূত-পবিত্র। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ ও ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। তাঁরা আমাদের প্রিয়নবির প্রতিও দরুদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। তাঁরা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের কর্মীবাহিনী। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তাঁদের পানাহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানেন না। তাঁদের কোনো নিজস্ব মত ও কর্মসূচি নেই। মানব চোখের অন্তরালে তাঁরা অবস্থান করেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহর আদেশের বাইরে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। মহান আল্লাহ যাকে যে কাজে নিয়োজিত করেন, তিনি সে কাজেই নিয়োজিত থাকেন। কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হন না।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَاَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّقُوۡدُهَا النَّاسُ وَالۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

অর্থ: হে মু'মিনগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করে না, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়।
(সূরা আত-তাহরিম, আয়াত: ৬)

ফেরেশতাগণের গঠন ও আকৃতি:

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বিশেষ আকৃতিতে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা যখন যে রূপ ধারণ করতে বলেন তাঁরা তখন সেই রূপই ধারণ করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ جَاعِلِ الۡمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا اُولِیۡۤ اَجۡنِحَۃٍ مَّثۡنٰی وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ؕ یَزِیۡدُ فِی الۡخَلۡقِ مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমিনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট।

(সুরা আল-ফাতির, আয়াত: ১)

প্রধান চার ফেরেশতা:

ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন প্রধান ফেরেশতা আছেন। তাঁরা মহান আল্লাহর আদেশে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত আছেন। ফেরেশতা চারজন হলেন:

১. জিবরাঈল (আ.): তাঁকে সকল ফেরেশতাগণের সরদার বলা হয়। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তিনিই পবিত্র বাণী নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবির (সা.)-এর কাছে আসতেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য কর্তব্যরত ফেরেশতাগণের নিকট বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেন।

২. মিকাঈল (আ.): তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপাদন ও সকল জীবের জীবিকা বণ্টন। এ ছাড়া বজ্রপাত ঘটানোর কাজও মিকাঈল (আ.)-এর দায়িত্বে।

৩. ইসরাফিল (আ.): তাঁর দায়িত্ব মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া। ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৪. আজরাঈল (আ.): যিনি মালাকুল মওত নামেও পরিচিত। মহান আল্লাহ পাকের আদেশে প্রাণিকুলের জান কবজের কাজে তিনি নিয়োজিত।

এ ছাড়াও কিছু ফেরেশতা মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন। তাঁদের বলা হয় কিরামান কাতিবিন। কিন্তু ফেরেশতা মানুষকে জাগ্রত অবস্থায়, নিদ্রায়, সফরে, বাড়িতে সর্বত্র সব সময় হেফাজত করেন। তাঁদের বলা হয় 'মুয়াক্কিবাত'। কিছু আছেন জান্নাত-জাহান্নামের পাহারায়। উল্লেখ্য যে, জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার নাম 'রেদওয়ান'। আর জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতার নাম 'মালেক'। কতিপয় ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন আল্লাহর আরশ বহনের দায়িত্বে। একদল ফেরেশতা আছেন যাঁরা আল্লাহর জিকিরের মজলিসে মজলিসে ঘুরে বেড়ান। কিছু ফেরেশতা পাহাড়ের হেফাজতে আছেন। কিছু ফেরেশতা আল্লাহর সম্মানে সারাক্ষণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে আরও অসংখ্য অগণিত ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের অর্থ:

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান অর্থ হলো ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, আল্লাহ কর্তৃক তাদের নূর থেকে সৃষ্টি হওয়ায় বিশ্বাস করা, নাম, গুণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ যা বলেছে তা মেনে নেওয়া।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত –

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

অর্থ: রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা বাকারা: ২৮৫)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব:

ফেরেশতাদের অস্বীকার করা কুফরি, কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করার নামান্তর।
তারা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন, তাই তাদের প্রতি ঈমান গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।
ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দোয়া করেন, তাই তাদের বিশ্বাস আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান হলো অদৃশ্য জগতের প্রতি আস্থা, যা মুমিনের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকওয়া বাড়ায়। এটি শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং আমলের অনুপ্রেরণা।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ الۡكِتٰبِ الَّذِیۡ نَزَّلَ عَلٰی رَسُوۡلِهٖ وَ الۡكِتٰبِ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ مِنۡ قَبۡلُ ؕ وَ مَنۡ يَّكۡفُرۡ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيۡدًا

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। (সূরা আন-নিসা: ১৩৬)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টির প্রতি আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে তা হচ্ছে- প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন করে ফেরেশতা থাকে। এ ফেরেশতাদ্বয় ব্যক্তির আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। "স্মরণ করুন!দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" [সূরা কাফ, আয়াত ১৭-১৮] অর্থাৎ এ শ্রেণীর ফেরেশতা সর্বদা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকে।

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনা ফরজ বা অত্যাবশ্যক।
সুতরাং, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে ফেরেশতাদের প্রতি সঠিক ঈমান দান করুন,আমীন।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান:

আল্লাহর কিতাব:

ঈমানের মূল স্তম্ভগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নবি-রাসুলগণের ওপর অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যেসব কিতাব বা গ্রন্থ লাভ করেছেন সেসব ধর্মগ্রন্থই আল্লাহর কিতাব। এগুলোকে আসমানি কিতাবও বলা হয়।

মহান আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবি-রাসুলগণ তা সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত নাজিলকৃত সব আসমানি কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অঙ্গ।

কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার অর্থ ও তাৎপর্য:

মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা হিসেবে সত্য ধর্ম নিয়ে সকল আসমানি কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলো আল্লাহর কালাম বা বাণী। এ বাণীসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) এর মাধ্যমে রাসুলগণের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো-যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোকে সত্য বলে মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করা।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ:রাসূল (সা.) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রতি এবং মুমিনগণও (তদ্রূপ)। সকলেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসূলদের

মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
(সূরা বাকারা: ২৮৫)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমানের মূলনীতিগুলো উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান অন্তর্ভুক্ত।

কিতাবসমূহের পরিচিতি:
আল-কুরআনে কেবল ৪ খানা প্রধান কিতাব এবং ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম ও প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আল কুরআনে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি কতিপয় 'সহিফা' (পুস্তিকা বা ছোট কিতাব) নাজিলের এবং যুগে যুগে অন্যান্য রাসুলগণের (আ.) উপর আরও অনেক সহিফা নাজিলের কথা উল্লেখ আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি রয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে; ইব্রাহীম ও মুসার সহিফাসমূহে।' (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৮-১৯) কিন্তু এগুলোর নাম ও সংখ্যা আল কুরআনে বর্ণিত হয়নি। একমতে, এ সহিফাসমূহের সংখ্যা মোট ১০০ খানা। সে অনুসারে প্রধান চার কিতাব ও সহীফাসমূহ মিলিয়ে মোট আসমানি কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা।
প্রধান চারখানা কিতাব হলো-

১. তাওরাত:
তাওরাত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

অর্থ:নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো। (সূরা আল মায়িদা:৪৪)

২. যাবুর:
এ গ্রন্থ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থ:আমি কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর আমি দাঊদকে যাবূর দিয়েছিলাম।
(সূরা আল ইসরা: ৫৫)

৩. ইঞ্জিল:
এটি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۗ

অর্থ: আমি তাদের (নবীগণের) পর মারয়ামের পুত্র ঈসাকে তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সমর্থকরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং আমি তাকে ইনজিল দিয়েছিলাম, যাতে ছিল হিদায়াত ও আলো এবং (তা দিয়েছিলাম) তার পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সমর্থক এবং মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশরূপে। (সূরা আল মায়িদা: ৪৬)

৪. আল-কুরআন:
আল কুরআন শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রতি অবতীর্ণ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ ٣
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ٤

অর্থ: তিনি সত্য সহকারে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্বতন কিতাবের সমর্থক এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন ।ইতোপূর্বে মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি সেই মানদন্ড নাযিল করেছেন যা হাক্ব ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে

দেয়; নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফুরী করে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।
(সূরা আল ইমরান: ৩-৪)

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা ঈমানের মৌলিক বিষয়ের মধ্যে একটি। আমরা জানা-অজানা সকল আসমানি কিতাবে বিশ্বাস রাখব এবং আল কুরআনের বিধি-বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوۡهُ وَ اتَّقُوۡا لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۙ

অর্থ: আর এটি কিতাব- যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। (সূরা আল আনআম: ১৫৫)

কুরআন একমাত্র আসমানী কিতাব যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক। (সূরা আল-হিজর: ৯)

ইসলামী দৃষ্টিকোণে পূর্ববর্তী কিতাবের মর্যাদা:

এগুলোর মূল শিক্ষা (তাওহিদ, নবুয়ত) সত্য ছিল।
কিন্তু মানুষ এগুলো পরিবর্তন বা লুকিয়ে ফেলেছে।
এখন শুধু কুরআনই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত –

تِلۡكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ نَتۡلُوۡهَا عَلَیۡكَ بِالۡحَقِّ ۚ فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰهِ وَ اٰیٰتِهٖ یُؤۡمِنُوۡنَ

অর্থ: এগুলো আল্লাহর আয়াত, আমি তা যথাযথভাবেই তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি। অতএব তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে?

(সূরা আল-জাসিয়া: ৬)

প্রধান আসমানী কিতাবগুলোর হলো তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। প্রথম তিনটি কিতাবের মূল সংস্করণ হারিয়ে গেছে বা বিকৃত হয়েছে, তাই মুসলমানদের জন্য কুরআনই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন।
নিম্নে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আসমানী কিতাবসমূহের সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করুন,আমীন।

৪. নবী-রাসুলদের প্রতি ঈমান:
নবী-রাসুলদের প্রতি ঈমান হল ইসলামের ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।
মানব জাতিকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন।
রাসুলগণ আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি। তাঁদের প্রচারিত বাণী আল্লাহরই বাণী। এই বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো রাসুলগণের প্রতি ইমান। রাসুলগণের প্রতি ইমান বলতে নবি-রাসুল উভয়কে বুঝানো হয়েছে।
রাসুল শব্দটি রিসালাত শব্দ থেকে এসেছে। রিসালাত শব্দের শাব্দিক অর্থ চিঠি, বার্তা, সংবাদ ইত্যাদি। সুতরাং রিসালাত বলতে আল্লাহ তা'আলার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে বোঝায়। এ দায়িত্ব পালনকারীকে রাসুল বলা হয়। রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া মুমিন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য।

নবী-রাসুলগণের প্রতি ইমান আনার অপরিহার্যতা:

ঈমানের পূর্ণতার জন্য ইসলামের ৬টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।নবী-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সুতরাং রাসুলগণের প্রতি ইমান না আনলে তাওহিদে বিশ্বাস পূর্ণ হবে না। নবি-রাসুলগণের কাউকে বিশ্বাস করা আর কাউকে অবিশ্বাস করা যাবে না। বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবি-রাসুল হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

অর্থ: তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না। (সূরা আল-হুজুরাত: ১৫)

নবী-রাসুলগণের বৈশিষ্ট্য:
নবি-রাসুলগণ মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মাসুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা ছিলেন মিষ্টভাষী, ভদ্র, বিনয়ী, ধৈর্যশীল, সহনশীল, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, প্রতিকূল পরিবেশে তাওহিদের দাওয়াত প্রদানকারী এবং সৎকর্মশীল।

নবি-রাসুলগণের অনুসরণ:
মানব জাতিকে হেদায়েতের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা অনেক নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবি-রাসুলগণ ওহির মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করতেন। তাঁরা একদিকে ছিলেন সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, অন্যদিকে ছিলেন উন্নত চরিত্রের অধিকারী। নবি-রাসুলগণ মানবজাতিকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা সে অনুযায়ী আমল করবে তারা মৃত্যুর পর মহা সুখের জান্নাত লাভ করবে। আর যারা নবি-রাসুলের অনুসরণ না করে পাপ কাজে লিপ্ত হবে তাদের জন্য পরকালে রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাই নবি-রাসুলের অনুসরণ করা সবার ইমানি দায়িত্ব।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আল-আহযাব: ৭১)

আমরা সবাই আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে অনুসরণ করবো।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ও নবিগণের মর্যাদা:

আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসুলগণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবি-রাসুলদের একেক জনকে মহান আল্লাহ বিশেষ বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। যেমন হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা 'খলিল' বা বন্ধু বলে আখ্যায়িত করছেন। হযরত সুলাইমান (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)-কে নবুওয়াত ও বাদশাহী দান করেছিলেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-কে ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-কে তুর পাহাড়ে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল 'রুহুল্লাহ'। তিনি দোলনায় থাকাকালেই কথা বলেছেন। এ ছাড়া মহান আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন। এভাবেই সব নবি-রাসুলকে আল্লাহ তা'আলা আলাদা আলাদা মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ

অর্থ: এ রাসুলগণ, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যাঁর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।' (সূরা আল-বাকারা : ২৫৩)

কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে সবার উপরে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল ছিলেন। তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কেবল এ পৃথিবী আর মানুষই নয়; বরং জগৎসমূহের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সবার ওপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَك ۝

অর্থ: এবং আমি আপনার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি। (সূরা আল-ইনশিরাহ: ৪)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنُكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ۝

অর্থ: আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। (সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানের নেতা হবো। আর এ কথা গর্ব করে বলছি না'। তিনি আরো বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবো। আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম কবুল করা হবে'। (তিরমিযি)

নবী-রাসুলের পার্থক্য:

নবী শব্দের অর্থ সংবাদবাহক। আর রাসুল শব্দের অর্থ দূত। নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য হলো, আল্লাহ তা'আলা যাকে নতুন শরিয়ত দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান, তাঁকে রাসুল বলা হয়। আর যাকে নতুন শরিয়ত না দিয়ে পূর্বের রাসুলের শরিয়তই প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, তাঁকে নবী বলা হয়। প্রত্যেক রাসুলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবীই রাসুল নন।
প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ.) আর সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। নবীদের সংখ্যা ১লাখ ২৪ হাজার। তার মধ্যে ৩১৩ বা অন্য বর্ণনায় ৩১৫ জন রাসুল।

নবী-রাসুলদের প্রতি অবিশ্বাসের পরিণতি:
যারা নবী-রাসুলদের অবিশ্বাস করে বা তাদের মধ্যে পার্থক্য করে, তারা গোমরাহিতে পতিত হয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদেরকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায়, আর বলে, আমরা কিছুকে বিশ্বাস করি আর কিছুকে অবিশ্বাস করি, এবং এ দুয়ের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই সত্যিকারের কাফির। (সূরা আন-নিসা: ১৫০-১৫১)

নবী-রাসুলদের প্রতি ঈমান ইসলামের অপরিহার্য অংশ। তাদের জীবন ও শিক্ষা অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। আমরা সকল নবী-রাসুলের প্রতি সম্মান রাখি এবং তাদের মধ্যে কোনো বিভেদ করি না। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে সঠিক পথে চলাই ঈমানের দাবি।

আখিরাতের প্রতি ঈমান :

আখিরাতের প্রতি ঈমান ইসলামের মৌলিক ঈমানের অন্যতম। এটি বিশ্বাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মানুষের কর্ম ও চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। আখিরাত হলো মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবন, যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

আখিরাতের অর্থ ও গুরুত্ব:
আখিরাত শব্দের অর্থ হলো 'পরকাল' বা 'শেষ সময়'। এটি দুনিয়ার জীবনের পরের চিরস্থায়ী জীবন, যা কিয়ামতের মাধ্যমে শুরু হবে।

কুরআনে অসংখ্য আয়াতে আখিরাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ঈমানের অঙ্গ, যা ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু হতে উদ্বুদ্ধ করে।

আখিরাতের জীবনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. পুনরুত্থান:

পুনরুত্থান অর্থ পুনরায় উত্থান, কবর হতে মৃতের উত্থান। মহান আল্লাহ মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ তথা পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু দান করেন। অতঃপর, তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা আল-জাছিয়া: ২৬)

মৃত্যুর পর মানুষ কবরে স্থান পায়, সেখানে তার আমল অনুযায়ী শাস্তি বা শান্তি দেওয়া হয়। নবী ﷺ বলেছেন, কবর হয় জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তগুলোর একটি গর্ত। (তিরমিযী)

২.কিয়ামত:

কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে মহান আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন। তিনি ছাড়া কেউ তা জানেন না। যখন আল্লাহর নির্ধারিত সময় চলে আসবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) কর্তৃক শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত বা মহাপ্রলয় ঘটবে। এ মহাপ্রলয়ের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত মানুষ ভয়ে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো ছুটাছুটি করতে থাকবে। তারা তাদের পরিবারের লোকদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তারা ফিরে যাবার অবকাশ পাবে না। বন্য পশুরা ভয়ে একত্রিত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়।' (সূরা আল-হাজ্জ: ১-২)

৩.হাশর:

হাশর অর্থ একত্রিত হওয়া। মহান আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে সবাই পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ দিন সবাই নিজ নিজ কর্মফলপ্রাপ্ত হবে। তাই এটি 'ইয়াউমুদ্দিন' বা কর্মফল দিবস।

পৃথিবীই হবে হাশরের মাঠ। কিয়ামতের দিন পৃথিবী পরিণত হবে একটা উদ্ভিদশূন্য মসৃণ সমতল প্রান্তরে। মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে। হাশরের দিনের দৈর্ঘ্য হবে আমাদের গণনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

আর এ দিনটিই হবে কবর থেকে জীবিত হয়ে ওঠার দিন। প্রত্যেক মানুষ ভীত-শঙ্কিত চোখে তাদের কবর থেকে বের হয়ে আসবে। তারা বলবে, হায়! আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে জাগিয়ে তুলল। তারা আহবানকারীর দিকে দৌঁড়াতে থাকবে। তাদেরকে মনে হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। কাফিররা বলবে, এটা তো কঠিন দিন। সহসাই সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হয়ে যাবে। মানুষ মনে করবে তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।

সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা দেওয়া হবে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, কোনো অবিচার থাকবে না।

মীযান (দাঁড়িপাল্লা) মানুষের ভালো ও মন্দ কাজ ওজন করা হবে।

সিরাত (পুল) এটি একটি সূক্ষ্ম সেতু, যা জাহান্নামের উপর দিয়ে জান্নাতে যাবে। সৎকর্মশীলরা সহজে পার হবে, পাপীরা পড়ে যাবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম:

জান্নাত: জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘‘বাগান’’। আখিরাতে নেককার মুমিনগণের জন্য যে মহা-নিয়ামতপূর্ণ আবাসস্থল আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন তাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘‘জান্নাত’’ বলা হয়। জান্নাতের বিভিন্ন স্তর, পর্যায় ও নাম রয়েছে। ফার্সী ভাষায় জান্নাতকে ‘‘বেহেশত’’ বলা হয়, যা বাংলা ভাষায় বহুল-ব্যবহৃত।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের চিরস্থায়ী আবাস, যেখানে রয়েছে অফুরন্ত নিয়ামত।

জাহান্নাম: জাহান্নাম শব্দের মূল অর্থ ‘‘গভীরগর্ত কূপ’’। মহান আল্লাহ আখিরাতে অবিশ্বাসী ও পাপীদের শাস্তির জন্য যে অগ্নিময় আবাস তৈরি করেছেন তাকে কুরআন-হাদীসে ‘‘জাহান্নাম’’ বলা হয়েছে। পাপীদের শাস্তির স্থান, যেখানে ভয়াবহ যন্ত্রণা দেওয়া হবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের মূল বিষয় জান্নাত ও জাহান্নামের বিশ্বাস। শেষ বিচারের পরে বান্দারা জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জান্নাতীগণ অনন্তকাল জান্নাতে অবস্থান করবেন এবং আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করবেন। জাহান্নামীগণের মধ্যে যারা মুমিন তারা এক পর্যায়ে জাহান্নাম

থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। জাহান্নামের অবশিষ্ট বাসিন্দারা অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান ও শাস্তিভোগ করবেন।

আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব:
ব্যক্তিগত জীবনে মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে উৎসাহিত করে।
সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার, সততা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করে।
আধ্যাত্মিক উন্নতি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে এবং ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল শেখায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন,
মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করো, যা দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ নষ্ট করে দেয়। (ইবনে মাজাহ)

আখিরাতের প্রতি ঈমানের দাবি:
মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।
দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলা।
হিসাবের ভয় ও আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।
আখিরাতের প্রতি ঈমান মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ থেকে মুক্ত রাখে। এটি ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা ব্যক্তিকে পরকালীন সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করে।

আল্লাহ তা’আলা আমাদের সবাইকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার তাওফীক দান, আমীন।

৬.তাকদিরের প্রতি ঈমান:
তাকদির আরবি শব্দ এর অর্থ নির্ধারণ করা, নির্দিষ্ট করা, ধার্য করা, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি। এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে তাকদিরসহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর কোথায়, কোন সময় কী ঘটবে এবং কীভাবে ঘটবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তা পূর্ব নির্ধারিত। পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপর 'যত বিপদ আসে তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে (তাকদিরে) লিপিবদ্ধ আছে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। অতএব কোনো কিছু হারিয়ে গেলে আফসোস করা যাবে না। আবার ভালো কিছু পাওয়ায় আনন্দে আত্মহারা হওয়া যাবে না।

সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। কারণ ভালো-মন্দ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়। তাকদিরের বাইরে কোনো কিছুই নেই। সবকিছুই তাকদির অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তাও।
তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃত মুমিন হতে হলে অবশ্যই তাকদির বিশ্বাস করতে হবে। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থাকা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক।

তাকদিরের প্রকারভেদ:

তাকদির দুই প্রকার। যথা:
১. তাকদিরে মুবরাম অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় তাকদির ও
২. তাকদিরে মুআল্লাক অর্থাৎ পরিবর্তনযোগ্য তাকদির।

তাকদিরে মুবরাম কখনোই পরিবর্তিত হয় না। আর তাকদিরে মুআল্লাক বান্দার নেক আমল, দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দোয়া ভাগ্যকে পরিবর্তন করাতে পারে। আর নেক আমল বয়সকে বৃদ্ধি করাতে পারে।' (তিরমিযি)

তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভালো-মন্দ ইত্যাদি কাজ করছে বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তা'আলা আলিমুল গায়েব। আমরা কখন কী করব, কী খাব, কোথায় কী ঘটবে- এগুলো আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই জানেন। ফলে তিনি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অনেকে প্রশ্ন করেন মানুষ ভালো-মন্দ যত কাজ করে তা আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে করে। তাহলে মানুষের কী দোষ? কেন আল্লাহ মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন? আসলে মহান আল্লাহ মানুষকে ভালো এবং মন্দ দুটি সুস্পষ্ট পথ দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যুলুম করেন না।
মহান আল্লাহ বলেন,

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

অর্থ: আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেওয়া যেতে পারে। আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না। (সূরা আল-জাছিয়া, আয়াত: ২২)

তাকদিরের গুরুত্ব :

আল্লাহ মানুষকে কর্মনির্ভর করে সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবীতে মানুষ চেষ্টা ছাড়া কোনো কিছুই পেতে পারে না। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন আর ভালো ও মন্দ কাজ করার স্বাধীনতা দান করেছেন। ভালো এবং মন্দ কাজ মানুষ স্ব-জ্ঞানে ও নিজ ইচ্ছায় করে থাকে। মহান আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় কাউকে ভালো বা মন্দ কাজ করার জন্য বাধ্য করেন না। যদি তিনি এরূপ করতেন তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ ইমানদার হয়ে যেত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থ: আর আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ইমান আনতো। তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন? (সূরা ইউনুস: ৯৯)

যে ব্যক্তি আল্লাহর দেখানো উত্তম পথে চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। আর যে নিজেকে পথভ্রষ্ট করে তার জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। অতএব নিজেদের খারাপ কাজগুলো আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাকদিরে লেখার কারণে হয়েছে এ ধরনের কথা বলে খারাপ কর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তাকদিরের দোহাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি বা জান্নাত লাভ করা যাবে না।

তাকদীরের প্রতি ঈমান হলো— আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞান, লিখন, ইচ্ছা ও সৃষ্টিতে বিশ্বাস রাখা। এটি মানুষকে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, হতাশা ও অহংকার থেকে মুক্ত করে এবং আল্লাহর রহমতের প্রতি আশাবাদী করে তোলে।
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। (সূরা আয-যুমার: ৩৭)

সুতরাং, আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাকদীরের সঠিক বুঝ দান করুন এবং এর উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন,আমীন।

ইসলামের কিছু মৌলিক বিষয় রয়েছে। এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করা ও আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। এগুলোর যেকোন একটিকে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। ইসলামের মৌলিক বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। ইসলামের এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ক ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ বলা হয়। ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলা ফরয ও ঈমানি দায়িত্ব।

পৃথিবীর সকল মাখলুককে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআনে এসেছে, 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে'। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)

ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরিয়ত সমর্থিত যে কোনো উত্তম কাজই ইবাদাত।

ইবাদাত:

ইবাদাত অর্থ আনুগত্য করা, বিনয় প্রকাশ করা, নমনীয় হওয়া, দাসত্ব করা। ইসলামি পরিভাষায় জীবনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলাকে ইবাদাত বলে।

ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। ইসলামের মূল কাঠামো যে পাঁচটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তাই ইসলামের স্তম্ভ। এগুলো হলো-

১.শাহাদাহ, ২.সালাত, ৩.সাওম, ৪.হজ্জ ও ৫.যাকাত।

এগুলো অবশ্যই পালনীয় ইবাদত, যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।

হাদিসে এসেছে:

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত"(সহিহ বুখারি)

১. শাহাদাহ:

শাহাদাহ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শাহাদাহ বা শাহাদাত ইসলামে প্রবেশের মূল চাবিকাঠি।

শাহাদাহ (الشهادة) অর্থ "সাক্ষ্য দেওয়া"।

সাক্ষ্য হলো:

"أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّهِ"

অর্থ:"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল।"

শাহাদাহ দু'টি অংশে গঠিত :

১.আল্লাহ ছাড়া অন্য সব মিথ্যা উপাস্যের অস্বীকার এবং একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের স্বীকৃতি।

২.মুহাম্মদ (ﷺ)-কে আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তাঁর শিক্ষা ও সুন্নাহ অনুসরণের অঙ্গীকার।

শাহাদাহ ছাড়া কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না।

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর একত্ব এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাসূলত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত –

وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ

অর্থ:তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরম দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা বাকারা: ১৬৩)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَ اُولُوا الۡعِلۡمِ قَآئِمًۢا بِالۡقِسۡطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ

অর্থ: আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আল ইমরান: ১৮)

হাদিসেও শাহাদাহর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাহাবীগণ প্রায়শই নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ থেকে শাহাদাহর স্বীকৃতি সম্পর্কে শুনেছেন এবং তা অনুসরণ করেছেন।

হাদিসের আলোকে শাহাদাহ:

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) সাক্ষ্য দিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারি: ১২৮)

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন:

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর রাসূল এ সাক্ষ্য প্রদান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোজা পালন করা এবং হজ্জ সম্পাদন করা।" (সহীহ বুখারী)

শাহাদাহর ফজিলত:

শাহাদাহ উচ্চারণ করাই ইসলাম গ্রহণের প্রথম ধাপ।

দৈনিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে যেমন: নামাজ, রোজা, হজ্জ সবই শাহাদাহর বাস্তবায়ন।

শাহাদাহ পাঠের মাধ্যমে শয়তান দূরে সরে যায়।

মৃত্যুর সময় সাক্ষ্য দেওয়া অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাসে শাহাদাহ বলা মুমিনের লক্ষণ।

অর্থাৎ শাহাদাহ সর্বোত্তম আমল।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে,

রাসুলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করা হল, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। (সহীহ মুসলিম ১৫১)

শাহাদাহ কবুলের শর্ত:

শুধু মুখে বললেই শাহাদাহ কবুল হয় না, এর জন্য প্রয়োজন:
১.(জ্ঞান) – অর্থ বুঝে বলা।
২.(দৃঢ় বিশ্বাস) – সন্দেহমুক্ত হওয়া।
৩.(একনিষ্ঠতা) – শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।
৪.(সত্যতা) – অন্তর ও বাহ্যিক আমলের মিল থাকা।
৫.(প্রেম) – আল্লাহ ও রাসুল (ﷺ)-কে মনে-প্রাণে ভালোবাসা।
৬.(আনুগত্য)– আল্লাহ তা'য়ালার বিধান মেনে চলা।
৭.(স্বীকৃতি) – মুখে ও মনে গ্রহণ করা।

যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস না করলে মুসলিম হওয়া যায় না : প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

১.তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:
আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক। তিনি ছাড়া অন্য কোনো স্রষ্টা বা পালনকর্তা নেই।
এতে অবিশ্বাস করলে শিরক হয় এবং মুসলিম থাকা যায় না।

২.তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ :
সব ইবাদত (প্রার্থনা, দুআ, কুরবানি, ভয়-ভক্তি, আশা-ভরসা) শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে।
কোনো প্রাণী, ফেরেশতা, নবী, পীর, মাজার বা সৃষ্টির উপাসনা করলে তা শিরক এবং ইসলাম বহির্ভূত কাজ।

৩.তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত:
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি (যেমন: সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, দয়ালু) কেবল আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণাবলি দেওয়া বা তাঁর মতো বিবেচনা করা শিরক।

যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে না, সে ইসলামের মৌলিক আকিদা থেকে বের হয়ে যায়। তাই তাওহীদের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকা মুসলিম হওয়ার অপরিহার্য শর্ত।

মোটকথা শাহাদাহ ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের প্রথমটি, যা মুসলিমদের ঈমানের মূলভিত্তি এবং মুসলিম জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।শাহাদাহ মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এর মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রেরিতত্বকে স্বীকার করে, যা ইসলামী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। অর্থাৎ, শাহাদাহ কেবল একটি বাক্য নয়, বরং এটি ঈমান, আমল ও আখলাকের সমন্বয়। কুরআন-হাদিসে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি মুমিনের জীবনের ভিত্তি এবং মৃত্যুর সময় শেষ আশ্রয়।

২. সালাত:
ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ঈমান গ্রহণের পর মুমিনের প্রথম পালনীয় ইবাদাত হচ্ছে সালাত। এটি মুমিনের মিরাজস্বরূপ এবং ঈমানের প্রমাণ। সালাত প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়।

সালাতের তাৎপর্য:

ঈমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি বা রুকন হলো সালাত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ফরয ইবাদাত হলো, সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে সালাতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের ওপর ফরয।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১০৩)
কুরআন মাজিদে প্রায় ৮২ স্থানে আল্লাহ তা'আলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।
মহান আল্লাহ আরো বলেন- 'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।' (সূরা ত্বাহা: ১৩২)

সালাতের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করব। নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ে সচেষ্ট হবো।

মহান আল্লাহ সফল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, 'আর যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।' (সূরা আল্-মুমিনুন, আয়াত: ৯)

সালাত বা নামাজ শব্দটির একটি অর্থ হলো 'সংযোগ'। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমরা নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি। নানা কারণে মাঝে মাঝে আমরা নিজেদেরকে অসহায় অনুভব করি। নিজেকে নিরুপায় ও একাকী মনে করার কোনো কারণ নেই। মহান আল্লাহ অবশ্যই আমাদের পাশে আছেন। যে কোনো সময় আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে, তাঁর সামনে মাথা নত করে বুকের ভেতর জমে থাকা সব দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হতাশা উজাড় করে দিতে পারি। তিনি অবশ্যই তা শুনবেন। তিনি সব কিছু শোনেন। আমরাই বরং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি না। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে। সালাত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির অন্তরের প্রশান্তি এবং তার সাহায্যকারী। সালাত বিপদ-আপদে আত্মাকে শক্তিশালী করে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন 'তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

সালাতের উপকারিতা:

সালাত আল্লাহর বিধান। এই বিধানটি মানুষের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন উপকার পেতে পারে। যেমন:

শারীরিক উপকারিতা:

সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে শরীর চর্চার অধিকাংশ উপকারিতাই পাওয়া যায়। যথাযথভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মেরুদন্ড, মাংসগ্রন্থি, ঘাড় ইত্যাদি অঙ্গের রোগের উপকার পাওয়া যায়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও জোড়ায় ব্যথ্যা সারানোর জন্য চিকিৎসকরা সালাত আদায়ের পরামর্শ দেন। এ কথা সত্য যে, সালাতে সিজদার সময় মস্তিষ্কতন্ত্রী, চোখ ও মাথাসহ অন্যান্য অঙ্গে রক্তপ্রবাহ পরিমিত। পর্যায়ে থাকে। ফলে চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্ক প্রখর হয়। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের শরীরকে

সচল ও কার্যকর রাখা নিশ্চিত করে। আলস্য বা কর্মবিমুখতা দূর হয়। তবে সালাতের মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রতি আত্ম-নিবেদন।

মানসিক উপকারিতা:

বর্তমানে মানুষের অশান্তির মূল কারণ হলো মানসিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধ্যান (Meditation) কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সালাত হলো এক উন্নতমানের ধ্যান (Meditation)। কেউ যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার সব অবস্থা জানেন, তাহলে তার কোনো প্রকার হতাশা থাকতে পারে না।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকারিতা:
মসজিদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর, যেখানে দৈনিক পাঁচবার
সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করা হয়। সেখানে ধনী-গরিব কোনো ভোদাভেদ থাকে না। সকলে স্ব স্ব পদমর্যাদা ভুলে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়। একে অপরের খোঁজ-খবর নিয়ে সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। ফলে মুসলিম সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর নিয়মিত সালাত আদায় করলে সমাজ হতে অপসংস্কৃতি দূর হয়।

সালাতের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য:

ইসলাম আমাদের দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আর এ দ্বীনের ভিত্তি হলো সালাত। সালাত সকল ইবাদাতের প্রধান। মুমিনের জন্য সালাত মিরাজ স্বরূপ। বস্তুত সালাতের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা অশেষ। সালাত আদায়ের মাধ্যমে। অগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়।

সালাতে রয়েছে দুনিয়া আখিরাতের মহা সফলতা। আল-কুরআনে বিনয় ও নম্রতার সাথে সালাত আদায়কারী মুমিনদের সফলকাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আল-মু'মিন:: ১-২)।

আবার অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার রবের নাম স্মরণ করে। ও সালাত কায়েম করে।' (সূরা আল-আ'লা: ১৪-১৫)

সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচার রক্ষাকবজ। কেননা সালাত কায়েমকারী নিজের মাঝে আল্লাহভীতি অনুভব করে যা তাকে সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাআতসমূহ:

ফজর: ফজরের সালাত মোট ৪ রাকাআত। এর মধ্যে ২ রাকাআত সুন্নত এবং ২ রাকাআত ফরয। প্রথমে সুন্নত আদায় করতে হয় এবং তারপরে ফরয আদায় করতে হয়। মনে রাখবে, ফজরের সুন্নত সালাতের গুরুত্ব অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নত সালাতের চেয়ে অনেক বেশি।

যোহর: যোহরের সালাত মোট ১০ রাকাআত। আর এগুলো হলো- ৪ রাকাআত সুন্নত মুয়াক্কাদাহ- যা সাধারণত এ ওয়াক্তের ফরয সালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়, তারপর ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয় এবং ফরযের পরে আরো ২ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করতে হয়।

আসর: আসরের সালাত ৪ রাকাআত-যা ফরয। তবে এ ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করা অনেক সাওয়াবের কাজ। তবে এটি না করলে কোন গুনাহ নেই।

মাগরিব: মাগরিবের সালাত মোট ৫ রাকাআত। এর মধ্যে ৩ রাকাআত ফরয এবং ফরয শেষে অনতিবিলম্বে ২ রাকাআত সুন্নত মুয়াক্কাদাহ সালাত আদায় করতে হয়।

এশা: এশার সালাত মোট ৬ রাকাআত। প্রথমে ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। তারপর ২ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করতে হয়। এশার ফরযের পূর্বেও ৪ রাকাআত সুন্নত সালাত আদায় করা হয়, যা না করলে কোন গুনাহ নেই, করলে সাওয়াব হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.) দিনের বিভিন্ন সময়ে নফল সালাত আদায় করতেন।

যেমন :

নফল সালাত: নফল অর্থ অতিরিক্ত। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত ব্যতীত যত প্রকারের অতিরিক্ত সালাত আছে সবই নফল সালাত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু সালাত মাঝে মাঝে আদায় করতেন আবার মাঝে মাঝে আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন, যাতে উম্মতের ওপর ওয়াজিব না হয়ে যায়।

সালাতুল আওয়াবিন:আওয়াবিন অর্থ নেককার ও অধিক তাওবাকারী বান্দাগণ। মাগরিবের সালাত আদায়ের পর এশার সালাতের পূর্বে যে সালাত আদায় করা হয় তাই সালাতুল আওয়াবিন।

সালাতুত তাহাজ্জুদ:তাহাজ্জুদ আরবি শব্দ। এর অর্থ ঘুম থেকে জাগা, রাত জাগা, রাত জেগে ইবাদত করা। রাতের শেষভাগে সালাতুত তাহাজ্জুদ আদায় করা উত্তম।

সালাত না পড়ার শাস্তি:

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় না করা মহা অপরাধ ও বড় গুনাহ। যে ব্যক্তি সালাতকে অবহেলা করে সালাত পরিত্যাগ করে, এর ফরয অস্বীকার করে, জেনেও যে আল্লাহ তা আদায় করতে আদেশ করেছেন, তাহলে উম্মতের ঐক্যমতের দ্বারা সে মুরতাদ এবং কাফের।

কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালার সতর্কতা বাণী:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অর্থ: অতঃপর তাদের পরে এমন এক সম্প্রদায় আসল যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কামনা-বাসনার অনুসরণ করল। সুতরাং তারা শীঘ্রই গোমরাহীর শাস্তি পাবে। (সুরা মারিয়াম: ৫৯)

বেনামাজির অবস্থান হবে সাকার নামক জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি কাজের হিসাব নেবেন। আর প্রতি কাজের হিসাব দিতে না পারলে শাস্তি অবধারিত। শাস্তি প্রাপ্ত

মানুষকে তাদের অপরাধে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদের অপরাধগুলোও বলতে থাকবে।

পরকালীন উপকারিতা:

সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।"

সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَٱسۡجُدۡۤ وَٱقۡتَرِب العلق

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও। (সূরা আল-'আলাক:১৯)

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং, সালাত হলো ঈমানের প্রাণ, গুনাহের কাফফারা এবং জান্নাতের চাবি। এটি শুধু ইবাদত নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ রাখে।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে নিয়মিত ও খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায়ের তাওফিক দান করুন, আমিন।

৩.সাওম:
সাওম (আরবি: الصوم) ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত, যেখানে সুবহে সাদিক (ফজরের সময়) থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত **ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও অন্যান্য রোজা ভঙ্গকারী কাজ থেকে বিরত থাকা হয়। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করা হয় এবং ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ।

সাওমের প্রকারভেদ:

১.ফরজ সাওম:
রমজান মাসের রোজা।
কোন কারণ বশত রমজানের রোজা ভঙ্গ হয়ে গেলে তার কাযা আদায়ে রোজা।
শরীয়তে স্বীকৃত কারণ ব্যতীত রমজানের রোজা ছেড়ে দিলে কাফফারা হিসেবে ৬০টি রোজা রাখা।
রোজার মান্নত করলে তা আদায় করা।

২.ওয়াজিব সাওম:
নফল রোজা রেখে ভঙ্গ করলে পরবর্তীতে তা আদায় করা ওয়াজিব।

৩.সুন্নত সাওম:
শাওয়ালের ৬ রোজা।
আশুরার রোজা (৯+১০ বা ১০+১১ মুহাররম)।
আইয়ামে বীজ (মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)।

৪.নফল সাওম:
সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা।

সাওমের উদ্দেশ্য:
সাওম রাখার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরহেজগারি বা তাকওয়া বৃদ্ধি করা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।
(সূরা বাকারা: ১৮৩)

সাওমের কিছু মৌলিক আচার আছে। যা ফরজ বলে চিহ্নিত। সুস্থ-সবল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে অবশ্যই সাওম রাখতে হবে। কিন্তু শারীরিক অসমর্থতার কারণে সে এ দায়িত্ব থেকে আপাতভাবে মুক্তি পেতে পারে। এর প্রতিবিধানে রয়েছে কাজা ও কাফফারার বিধান। নিচে সাওমের ফরজ ও শর্তগুলো দেওয়া হলো-

সাওমের ৩ ফরজ :

নিয়ত করা,
সব ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকা,
যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা।

সাওম রাখার ৪ শর্ত :
মুসলিম হওয়া,
বালেগ হওয়া,
অক্ষম না হওয়া,
ঋতুস্রাব থেকে বিরত থাকা নারী।

যে সব কারণে সাওম ভঙ্গ হয়:
ইচ্ছা করে বমি করা,

বমির বেশির ভাগ মুখে আসার পর তা গিলে ফেলা,
মেয়েদের মাসিক ও সন্তান প্রসবের পর ঋতুস্রাব,
গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন বা সেলাইন দিলে,
মুখ ভরে বমি করলে,
ভুলবশত কোনো কিছু খেয়ে, রোজা ভেঙে গেছে ভেবে ইচ্ছা করে আরও কিছু খেলে।

যেসব কারণে সাওম ভঙ্গ হয় না:
ভুলে কিছু খেলে বা পান করলে,
স্বপ্নদোষ হলে,
কুলি বা নাকে পানি দেওয়া।

সাওম ভঙ্গ হলে করণীয়:
বিনা কারণে সাওম ভঙ্গ করলে তাকে অবশ্যই কাজা-কাফফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব। যতটি সাওম ভঙ্গ হবে, ততটি সাওম আদায় করতে হবে। কাজা সাওম একটির পরিবর্তে একটি অর্থাৎ সাওমের কাজা হিসেবে শুধু একটি সাওম-ই যথেষ্ট।
ইচ্ছাকৃত সাওম ভাঙ্গলে ৬০ দিন একটানা সাওম রাখতে হবে।
অথবা ৬০ জন গরীবকে খাওয়ানো প্রতিদিন ২ বেলা খাওয়াতে হবে।

যেসব কারণে রমজান মাসে সাওম ভঙ্গ করা যাবে কিন্তু পরে কাজা করতে হয় তা হলো:
মুসাফির অবস্থায়,
রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধির বেশি আশঙ্কা থাকলে,
মাতৃগর্ভে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে,
এমন ক্ষুধা বা তৃষ্ণা হয়, যাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকতে পারে
শক্তিহীন বৃদ্ধ হলে,
মহিলাদের মাসিক হায়েজ-নেফাসকালীন রোজা ভঙ্গ করা যায়।

সাওমের ফজিলত:
রমযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের এক অনন্য মাস রমযান। এ মাসেই মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: 'রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে।' (সূরা আল বাকারা: ১৮৫)

অন্য আসমানি কিতাবসমূহও রমযান মাসেই নাযিল হয়েছে। ইবরাহিম (আ.)-এর ওপর সহিফাসমূহ রমযানের প্রথম রাতে নাযিল হয়। ষষ্ঠ রমযানে তাওরাত নাযিল হয়। তেরোতম রমযানে ইনজিল নাযিল হয়। আঠারতম রমযানে যাবুর নাযিল হয়। কুরআন মাজিদ নাযিল হয় রমযান মাসের কদর রাতে।

কুরআন মাজিদই রমযানের সুমহান মর্যাদার কারণ। এ মাসে আসমান থেকে রহমত নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'রমযানে রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়।' (বুখারি)

রমযানে এক মাস সাওম পালন করা ফরয। সাওম আল্লাহ তা'আলার খুবই পছন্দনীয় ইবাদাত। তাই সাওমের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা নিজে দিবেন। এ মাসে বান্দা যেহেতু সাওম পালন করে, তাই আল্লাহ তা'আলা সকল ইবাদাতের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। হাদিসে আরো বর্ণিত আছে, এ মাসে ওমরা আদায় করলে হজের সাওয়াব পাওয়া যায়। (বুখারি)

আল্লাহ তা'আলা গাফুরুর রাহিম। তিনি আমাদের গুনাহ মাফ করে দিতে চান। আমরা যাতে অন্যায় পথ ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার পথে ফিরে আসি, সে জন্য রমযানে আমাদের গুনাহ মাফের অনন্য সুযোগ রেখেছেন।

তাকওয়া অর্জনে সাওম:

তাকওয়া ও সাওমের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ অন্যায় থেকে দূরে থাকা, আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া। তাকওয়ার কারণে মানুষ হারাম কাজ থেকে দূরে থাকে। পক্ষান্তরে

সাওম পালনের জন্য আল্লাহর আদেশে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বান্দা পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে দূরে থাকে অথচ সেগুলো হালাল। তাই সাওম উঁচু স্তরের তাকওয়াপূর্ণ ইবাদাত। তাকওয়া ব্যতীত সাওম পালন সম্ভব নয়। কারণ সাওম পালনকারীর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় না থাকলে সে লুকিয়ে খাবার খেতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর ভয়েই সে সারাদিন পানাহার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাওম পালনের আদেশ দিয়েছেন যাতে আমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারি।

ঈদ:

ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ, উৎসব ইত্যাদি। ফিতর অর্থ রোযা ভঙ্গ করা। ঈদুল ফিতরের আভিধানিক অর্থ রোজা ভঙ্গ করার উৎসব। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। এক মাস সাওম পালন করার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা শাওয়াল মাসের প্রথম দিনকে রোযাদারের জন্য আনন্দ উদযাপন করার দিন।

মহানবি (সা.) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটি দিন দান করেছেন। আর তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। (আবু দাউদ)

সুতরাং, সাওম শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করা নয়, বরং এটি আত্মশুদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। রমজান মাসে এই প্রশিক্ষণ নিয়ে আমরা বছরের বাকি সময়টুকু তাকওয়ার সাথে জীবনযাপন করতে পারি।

যাকাত:

যাকাত (زكاة) এটি একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পরিশুদ্ধকরণ, পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া, বরকত হওয়া ইত্যাদি। এটি ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি এবং ফরজ ইবাদত, যা সম্পদশালী মুসলিমদের উপর আবশ্যক।

প্রত্যেক স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলমান নর-নারীকে প্রতি বছর স্বীয় আয় ও সম্পত্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ, যদি তা ইসলামী শরিয়ত নির্ধারিত সীমা (নিসাব পরিমাণ) অতিক্রম করে তবে গরীব-দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের নিয়মকে যাকাত বলা হয়। সাধারণত নির্ধারিত সীমার অধিক সম্পত্তি হিজরি ১ বছর ধরে থাকলে মোট সম্পত্তির ২.৫ শতাংশ (২.৫%) বা ১/৪০ অংশ বিতরণ করতে হয়।

যাকাত এর পরিভাষিক অর্থ:
নিজ অর্জিত ধন-সম্পদ থেকে আল্লাহ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও ফরজকৃত অংশ দেওয়া।

যাকাতের শর্তসমূহ:
স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে তার উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে।যেমন:

১. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা:
সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সম্পদ, মালিকের অধিকারে থাকা, সম্পদের উপর অন্যের অধিকার বা মালিকানা না থাকা এবং নিজের ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার থাকা। যেসকল সম্পদের মালিকানা সুসম্পষ্ট নয়, সেসকল সম্পদের কোনো যাকাত নেই, যেমন: সরকারি মালিকানাধীন সম্পদ। অনুরূপভাবে জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ওয়ক্ফকৃত সম্পদের উপরেও যাকাত ধার্য হবে না। তবে ওয়াক্ফ যদি কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের জন্য হয়, তবে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

২. সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া:
যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, প্রবৃদ্ধিশীল হতে হবে, অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি পাবার যোগ্যতাই যথেষ্ট। যেমন: গরু, মহিষ, ব্যবসায়ের মাল, নগদ অর্থ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রীত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল বর্ধনশীল। অর্থাৎ যেসকল মালামাল নিজের প্রবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম নয়, সেসবের উপর যাকাত ধার্য হবে না, যেমন: ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালামাল, চলাচলের বাহন ইত্যাদি।

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ
যাকাত ফরজ হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে শরীয়ত নির্ধারিত সীমাতিরিক্ত সম্পদ থাকা। সাধারণ ৫২.৫০ তোলা রূপা বা ০৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হয়। পশুর ক্ষেত্রে এই পরিমাণ বিভিন্ন (বিস্তারিত: 'যাকাত প্রদানের নিয়ম' দ্রষ্টব্য)।

৪. মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ থাকা:

সারা বছরের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে যে সম্পদ উদ্বৃত থাকবে, শুধুমাত্র তার উপরই যাকাত ফরজ হবে।

৫. ঋণমুক্ততা:
নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলেও ব্যক্তির ঋণমুক্ততা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত। যদি সম্পদের মালিক এত পরিমাণ ঋণগ্রস্থ হন যা, নিসাব পরিমাণ সম্পদও মিটাতে অক্ষম বা নিসাব পরিমাণ সম্পদ তার চেয়ে কম হয়, তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণ পরিশোধের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব হয়।

৬. সম্পদ এক বছর আয়ত্তাধীন থাকা:
নিসাব পরিমাণ স্বীয় সম্পদ ১ বছর নিজ আয়ত্তাধীন থাকা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বশর্ত।তবে কৃষিজাত ফসল, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির যাকাত (উশর) প্রতিবার ফসল তোলার সময়ই দিতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ও কোম্পানীর ক্ষেত্রে বছর শেষে উদ্বর্তপত্রে বর্ণিত সম্পদ ও দায়-দেনা অনুসারে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

যাকাতের গুরুত্ব:
যাকাত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। এটি শুধু ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। নিম্নে যাকাতের গুরুত্ব দেওয়া হলো:

যাকাত আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ও ফরজ ইবাদত।
কুরআনে সালাতের সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বারবার, যা এর গুরুত্বকে তুলে ধরে।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

وَ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ارۡکَعُوۡا مَعَ الرّٰکِعِیۡنَ

অর্থ:আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (সূরা বাকারা: ৪৩)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,
“যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যাকাত দেয়, আল্লাহ তার সম্পদে বরকত দেন” (বুখারী)।

আত্মশুদ্ধি ও লোভ দূরীকরণে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।
যাকাত বা পবিত্রতা মানুষের মনের লোভ, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা দূর করে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

خُذْ مِنْ اَمْوَالِہِمْ صَدَقَۃً تُطَہِّرُہُمْ وَتُزَکِّیۡہِمْ بِہَا

অর্থ: তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর, যা তাদেরকে পবিত্র করবে।(সূরা তাওবা: ১০৩)

যাকাত গুনাহ মাফের মাধ্যম। রাসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেছেন,
“সদকা (যাকাত) গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।”(ইবনে মাজাহ)

যাকাত অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।
যাকাত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার দ্বারা রাষ্ট্র ও মানুষের একটি বড় অংশ উপকৃত হয়। রাষ্ট্রের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে ইসলামের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ সমাজের গরিব, অসহায় ও ঋণগ্রস্তদের মধ্যে পৌঁছায়, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য কমায়।
যাকাত আদায় করলে সম্পদে বরকত বাড়ে এবং অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
রাসূল (ﷺ) বলেছেন,
“যাকাত দিয়ে তোমার সম্পদ কমবে না, বরং বৃদ্ধি পাবে।” (মুসলিম)।

যাকাত গরিবদের হতাশা ও হিংসা কমায়, ফলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।
যার ফলে সমাজের ধনী-গরিবের মধ্যে সৌহার্দ্য তৈরি করে।

যাকাতের ব্যক্তিগত ও নৈতিক গুরুত্ব :
যাকাত আত্মসংযম ও উদারতা শিক্ষা দেয়। মানুষকে কৃপণতা ত্যাগ করে এবং উদারতা ও দানশীলতা শেখায়। সম্পদ আল্লাহর দান। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। যাকাতদাতা কামিয়াব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনে সফল ব্যক্তিদের পরিচয় বর্ণনায় যাকাতকেও গণ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ عَنِ اللَّغۡوِ مُعۡرِضُوۡنَ ﴿۳﴾ وَ الَّذِیۡنَ هُمۡ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوۡنَ﴿۴﴾ ۙ

অর্থ: অবশ্যই সফলতা অর্জন করেছে মুমিনরা, যারা নিজেদের নামাজে বিনয় ও নম্র এবং যারা অনর্থক কথাবার্তায় নির্লিপ্ত আর যারা জাকাত দান করে থাকে।' (সুরা মুমিনুন: ১-৪)

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি:
যারা যাকাত আদায়ে উদাসীনতা দেখায় এবং কৃপণতা করে তাদের বিষয়ে কুরআনে করীমে কঠিন হুমকি এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

۞ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ كَثِیۡرًا مِّنَ الۡاَحۡبَارِ وَالرُّهۡبَانِ لَیَاۡكُلُوۡنَ اَمۡوَالَ النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ وَیَصُدُّوۡنَ عَنۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِیۡنَ یَكۡنِزُوۡنَ الذَّهَبَ وَالۡفِضَّةَ وَلَا یُنۡفِقُوۡنَهَا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرۡهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ۙ
٣٤
۞ یَّوۡمَ یُحۡمٰی عَلَیۡهَا فِیۡ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوٰی بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوۡبُهُمۡ وَظُهُوۡرُهُمۡ ؕ هٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِاَنۡفُسِكُمۡ فَذُوۡقُوۡا مَا كُنۡتُمۡ تَكۡنِزُوۡنَ ٣٥

অর্থ: হে বিশ্বাসীগণ, অবশ্যই 'আলিম ও দরবেশদের অনেকেই ভুয়ো কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষদের সম্পদ গ্রাস করে থাকে আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে আর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে আর তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) 'এটা হল, যা তোমরা নিজেদের জন্য স্তূপীকৃত করেছিলে, কাজেই যা জমা করছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর।'
(সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪,৩৫)

যে সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় না, তা অবশ্যই তা গচ্ছিত মাল যদ্বারা তার মালিককে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"সোনা রূপার মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন এ ধন সম্পদকে আগুনের পাত বানানো হবে এবং জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলো দ্বারা তার পার্শ্ব, ললাট ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হবে পূণরায় তা উত্তপ্ত করা হবে -এমন দিন যেদিনের পরিমাণ দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এভাবে বান্দার পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি চলতে থাকবে"

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ

অর্থ: আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। (সূরা আল ইমরান : ১৮০)

যে ধরনের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়:
চার ধরনের মালের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়:

এক- যমীন থেকে উৎপাদিত ফসল।

দুই- চতুষ্পদ জন্তু।

তিন- স্বর্ণ- রৌপ্য।

চার- ব্যবসায়িক মালামাল বা পণ্য।

উল্লিখিত চার শ্রেণির সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্ধারিত একটি পরিমাণ রয়েছে, তার কম হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

নিসারের পরিমাণ ও হিসাব:
স্বর্ণ: ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম (যদি কারো কাছে এ পরিমাণ সোনা থাকে, তবে এর মূল্যের ২.৫% যাকাত দিতে হবে)।
রুপা: ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম।
নগদ টাকা/ব্যবসায়িক পণ্য: বর্তমানে সোনা বা রূপার নিসাবের সমমূল্য।
গবাদি পশু: গরু/মহিষ: ৩০টির উপর ১টি (১ বছর বয়সী)।
ছাগল/ভেড়া: ৪০টির উপর ১টি।
সাধারণ সম্পদ: ২.৫% (১/৪০ অংশ)।
কৃষি ফসল: স্বাভাবিক সেচে: ৫%।
কৃত্রিম সেচে: ১০%
খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন:২০%

যাকাত পাওয়ার যোগ্য ৮ শ্রেণি
কুরআনের (সূরা তাওবা: ৬০) অনুসারে :
১.ফকির:যার সম্পদ নিসাবের নিচে।
২.মিসকিন:সম্পদহীন, জীবিকার অভাবে দিনাতিপাত করে।
৩.আমিল: যাকাত আদায়কারী কর্মচারী।
৪.মুয়াল্লাফাতুল কুলুব: নতুন মুসলিম বা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি।
৫.রিকাব: দাসমুক্তির জন্য।
৬.গারিম:ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি।
৭.ফি সাবিলিল্লাহ: আল্লাহর পথে জিহাদ বা দ্বীনি কাজে নিয়োজিত।
৮.ইবনুস সাবিল: ভ্রমণকালে অসহায় মুসাফির

মা-বাবা, সন্তান বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ।

যাকাত প্রদানের নিয়ম:
নিয়ত: যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পদ আলাদা করা।
সময়: যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা।

সরাসরি গরিব-মিসকিনকে হাতে হস্তান্তর।
আত্মীয়-স্বজন (যদি তারা হকদার হয়)।
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বণ্টন।

যাকাত আদায় না করার পরিণতি
দুনিয়ায় শাস্তি:
সম্পদে বরকত কমে যায়, সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

আখিরাতে শাস্তি: কুরআনে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে,"যারা সোনা-রুপা জমা করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন।" (সূরা তাওবা: ৩৪)

সুতরাং, যাকাত শুধু একটি আর্থিক ইবাদত নয়, বরং এটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যের হাতিয়ার। এটি সম্পদে বরকত আনে, গরিবের হক আদায় করে এবং সমাজে সম্প্রীতি গড়ে তোলে। তাই প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমের উচিত সঠিকভাবে যাকাত হিসাব করে আদায় করা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের পরকালের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের আশায় যথাযথভাবে জাকাত আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হজ্জ:

ইসলাম ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ।
হজ্জের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়, নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু কর্ম সম্পাদন করা।
আর উমরা হজ্জের মতোই কিছু আমল অন্তর্ভুক্ত করে, তবে হজ্জের তুলনায় সহজ ও সংক্ষিপ্ত।
উমরার আভিধানিক অর্থ : যিয়ারত করা। শরীয়তের পরিভাষায় উমরা অর্থ, নির্দিষ্ট কিছু কর্ম অর্থাৎ ইহরাম, তাওয়াফ, সাঈ ও মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা।

উমরা হলো আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি সুযোগ। এটি হজ্জের চেয়ে সহজ হলেও এর ফজিলত অপরিসীম। সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য এটি একটি মহৎ ইবাদত ।

হজ্জের সাথে উমরার পার্থক্য:
হজ্জ ফরজ ও নির্দিষ্ট সময়ে (জিলহজ মাসে) পালন করা হয়, আর উমরা সুন্নত এবং বছরের যেকোনো সময় করা যায় (শুধু ৯-১৩ জিলহজ ছাড়া) ।
উমরায় আরাফাত বা মুযদালিফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ ইত্যাদি আমল নেই ।

হজ্জ হলো মুসলমানদের জন্য পবিত্রতম শহর সৌদি আরবের মক্কায় অনুষ্ঠিত একটি বার্ষিক ইসলামি সফর।
হজ্জ মূলত কায়িক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বিত একটি ইবাদত। তাই উভয় দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর হজ্জ পালন করা ফরয। অর্থাৎ হজ্জ আদায়ে সক্ষম এমন শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত হজ্জে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং হজ্ব আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সক্ষম এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব আদায় করা ফরয। হজ্ব প্রত্যেক মুসলমানের উপর সারা জীবনে একবারই ফরয হয়। একবার ফরয হজ্ব আদায়ের পর পরবর্তী হজ্বগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে।

হজ্জ যেহেতু একবারই ফরয তাই যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে সে যদি মৃত্যুর আগে যে কোনো বছর হজ্ব আদায় করে, তবে তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হজ্জ বিধানের মৌলিক তাৎপর্য, তার যথার্থ দাবি ও আসল হুকুম হচ্ছে হজ্জ ফরয হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা। বিনা ওজরে বিলম্ব না করা। কারণ বিনা ওজরে বিলম্ব করাও গুনাহ। আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল ফরয হজ্জ আদায়ের প্রতি এমনভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন যে, কেউ যদি এই হজ্জকে অস্বীকার করে বা এ বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলা প্রদর্শন করে তবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত ও হতভাগ্যরূপে বিবেচিত হবে।

কুরআনে হজ্জের নির্দেশ:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

অর্থ: আর মানুষের মধ্যে যারা সেখানে (বায়তুল্লাহ) পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা ফরয। (সূরা আল-ইমরান: ৯৭)

তাছাড়া যে কোনো ধরনের বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হওয়া বা মৃত্যুর ডাক এসে যাওয়া তো অস্বাভাবিক নয়। তাই হজ্ব ফরয হওয়ার পর বিলম্ব করলে পরে সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে বা মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাআলার নিকট অপরাধী হিসেবেই তাকে হাজির হতে হবে। এজন্যই হাদীস শরীফে হজ্ব ফরয হওয়ামাত্র আদায় করার তাগিদ ও হুকুম দেওয়া হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–
যে ব্যক্তি হজ্ব করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সুনানে তিরমিযী)

হজ্জের প্রকারভেদ :
হজ্জ তিনভাবে আদায় করা যায় : হজ্জে তামাত্তু, হজ্জে কিরান ও হজ্জে ইফরাদ।
নিম্নে দেওয়া হলো–

১.হজ্জে তামাত্তু
হজ্জে তামাত্তুর পরিচয় :
হজের মাসগুলোতে হজের সফরে বের হবার পর প্রথমে শুধু উমরার ইহরাম বাঁধা এবং সাথে সাথে এ উমরার পরে হজের জন্য ইহরাম বাঁধার নিয়তও থাকা।

হজ্জে তামাত্তুর নিয়ম :
হাজী সাহেব হজের মাসগুলোতে প্রথমে শুধু উমরার জন্য তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে ইহরাম বাঁধবেন। তারপর তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করে মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার মাধ্যমে উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবেন এবং স্বাভাবিক কাপড় পরে নেবেন। তারপর যিলহজ মাসের আট তারিখ মিনা যাবার আগে নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজের ইহরাম বাঁধবেন।

২. হজ্জে কিরান:
হজ্জে কিরানের পরিচয় :

উমরার সাথে যুক্ত করে একই সফরে ও একই ইহরামে উমরা ও হজ আদায় করাকে কিরান হজ বলে।

হজ্জে কিরানের নিয়ম:

হজ্জে কিরান দু'ভাবে আদায় করা যায়।

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় একই সাথে হজ ও উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (লাব্বাইকা উমরাতান ওয়া হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। তারপর মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা আদায় করা এবং ইহরাম অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করা। অতঃপর হজের সময় ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনা-আরাফা-মুযদালিফায় গমন এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা।

২. মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধা। পবিত্র মক্কায় পৌঁছার পর উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে হজ্জের নিয়ত উমরার সাথে যুক্ত করে নেয়া। উমরার তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে ইহরাম অবস্থায় হজের অপেক্ষায় থাকা এবং ৮ যিলহজ ইহরামসহ মিনায় গমন ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করা।

হজ্জে ইফরাদ:

হজ্জে ইফরাদের পরিচয় :

হজ্জের মাসগুলোতে শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করাকে ইফরাদ হজ্জ বলে।

হজ্জে ইফরাদের নিয়ম :

হজ্জের মাসগুলোতে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্যلَبَّيْكَ حَجًّا (লাব্বাইকা হজ্জান) বলে তালবিয়া পাঠ শুরু করা। এরপর মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদূম অর্থাৎ আগমনী তাওয়াফ এবং হজ্জের জন্য সাঈ করা। অতঃপর ১০ যিলহজ কুরবানীর দিন হালাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকা। এরপর হজ্জের অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করা।

বদলী হজ্জ:

যদি কোন ব্যক্তির ওপর হজ ফরয ও উমরা ওয়াজিব হয়; কিন্তু সে সশরীরে তা আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির হজ্জ পালনকে বদলী হজ্জ এবং উমরা আদায়কে বদলী উমরা বলা হয়। বেশ কিছু হাদীস দ্বারা বদলী হজ্জ ও বদলী উমরার বিধান প্রমাণিত হয়। যেমন ইবন আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, খাছআম গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন,

'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যা হজ্জের ব্যাপারে ফরয করেছেন তা আমার পিতাকে খুব বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে। তিনি বাহনের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তবে কি আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ', ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার।

হজ্জের ধাপসমূহ:

১. ইহরাম বাঁধা (হজ্জের প্রথম ধাপ)

মীকাত থেকে ইহরাম–

মীকাত: মীকাত শব্দের অর্থ, নির্ধারিত সীমারেখা। স্থান বা কালের নির্ধারিত সীমারেখাকে মীকাত বলে। অর্থাৎ হজ্জ বা উমরা পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ছাড়া যে স্থান অতিক্রম করা যায় না, অথবা যে সময়ের পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা যায় না সেটাই মীকাত।

হজ্জ বা উমরার নিয়তে নির্দিষ্ট সীমানায় প্রবেশের আগে ইহরাম বাঁধতে হয়। সৌদি আরবের চারপাশে অবস্থিত

ইহরাম বাঁধার পূর্বে নিচের বিষয়গুলি সুন্নত :

নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা, বগল ও নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা। গোসল করা।ইহরাম বাঁধার পূর্বে শরীরে, মাথায় ও দাড়িতে উত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম:

সেলাইবিহীন সাদা লুঙ্গি ও সাদা চাদর পরা এবং এক জোড়া জুতো বা স্যান্ডেল পায়ে দেয়া।সাদা কাপড় পুরুষের সর্বোত্তম পোশাক। তাই পুরুষের ইহরামের জন্য সাদা কাপড়ের কথা বলা হয়েছে। ইহরামের ক্ষেত্রে মহিলার আলাদা কোন পোশাক নেই। শালীন ও ঢিলে-ঢালা, পর্দা বজায় থাকে এ ধরনের যেকোনো পোশাক পরে মহিলা ইহরাম বাঁধতে পারে।

ইহরাম অবস্থায় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও মাথা আবৃত করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ হলেও মহিলার জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে ইহরাম অবস্থায় নিকাব বা অনুরূপ কোন পোশাক দিয়ে সর্বক্ষণ চেহারা ঢেকে রাখা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে, 'মহিলা যেন নেকাব না লাগায় ও হাতমোজা না পরে। সালাতের পর ইহরাম বাঁধা।

তালবিয়া:

তালবিয়ার শব্দগুলো বেশি বেশি উচ্চারণ করা। কেননা তালবিয়া হজ্জের শ্লোগান। তালবিয়া যত বেশি পাঠ করা যাবে, তত বেশি সওয়াব অর্জিত হবে।

তালবিয়া হলো :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

অর্থ: আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাজির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নেই।

পুরুষগণ ইহরাম বাঁধার সময় ও পরে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবেন। পুরুষ-মহিলা সকলের ক্ষেত্রেই তালবিয়া পাঠ ও অন্যান্য যিকির সমূহের গুরুত্ব সমান। পার্থক্য এতটুকু যে, মহিলারা পুরুষের মত উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না। নিজে শুনতে পারে এতটুকু আওয়াজে মহিলারা তালবিয়া পাঠ ও অন্যান্য যিকিরসমূহ করবে।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ:

হজ ও উমরার ইহরামের ফলে যেসব বৈধ কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায় তা হলো: মাথার চুল ছোট করা বা পুরোপুরি মুণ্ডানো। হাত বা পায়ের নখ উপড়ে ফেলা, কর্তন কিংবা ছোট করা। ইহরাম বাঁধার পর শরীর, কাপড় কিংবা এ দু'টির সাথে সম্পৃক্ত অন্য কিছুতে সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করা। বিবাহ করা। ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা।

তাওয়াফ ও সাঈ:

মক্কায় পৌঁছে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফে কুদুম (আগমনী তাওয়াফ) করা। হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) থেকে শুরু করে ৭ চক্কর দেওয়া এবং প্রার্থনা (তালবিয়া) পাঠ করা।

[প্রতিটি চক্করে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ বা ইশারা করা।

তাওয়াফ সমাপ্তির পর মসজিদের অভ্যন্তরে কাবার কাছে অবস্থিত ইব্রাহিমের স্থানে (মাকামে ইব্রাহিম) দুই রাকাত নামাজ আদায় করা

তাওয়াফের পর কাবার নিকটে অবস্থিত সাফা ও মারওয়াহ পাহাড়ের মধ্যে সাতবার দৌড়ানো বা হাঁটার মাধ্যমে সাঈ করা।

৮ই জিলহজ্জ (তারবিয়া দিবস) ও মিনায় অবস্থান:
তারবিয়ার দিন হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার প্রথম দিন।
৮ জিলহজ্জ সকালে মক্কা থেকে মিনা গিয়ে দিন ও রাত অবস্থান করা। এদিন বিশেষ কোনো আমল নেই, শুধু নামাজ ও জিকির করা।

৯ই জিলহজ্জ (আরাফাতের দিন):
৯ জিলহজ্জ আরাফাতের দিন হিসাবে পরিচিত এবং এই দিনটিকে হজ্জের দিন বলা হয়।
ফজরের পর মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানে যাওয়া।
সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করে বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তিগফার করা।
হাজীদের আরাফাতে তাদের মাগরিব (সূর্যাস্ত) নামায না পড়েই সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফাত ত্যাগ করা। মুজদালিফা আরাফাত ও মিনার মধ্যবর্তী একটি এলাকা। সেখানে পৌঁছে, হজযাত্রীরা মাগরিব এবং ইশার নামায যৌথভাবে আদায় করেন, খোলা আকাশের নিচে মাটিতে নামাজ পড়েন এবং ঘুমিয়ে রাত কাটায় এবং পরের দিনের শয়তানকে এর পাথর নিক্ষেপের নিয়মের জন্য নুড়ি সংগ্রহ করেন।

১০ জিলহজ্জ(কুরবানি) :
মুজদালিফা থেকে ভোররাতে মিনায় গিয়ে বড় শয়তান (জামারাতুল আকাবা) কে ৭টি কঙ্কর মারা।
শয়তানকে পাথর ছুড়ে মারার পর ইব্রাহিম ও ইসমাইলের ঘটনা স্মরণে পশু কুরবানি দেওয়া। মক্কায় যখন কুরবানি হয়, তখন একই সময়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা ঈদুল আযহা নামে একটি তিন দিনের বিশ্বব্যাপী উৎসবে অনুরূপ ত্যাগ স্বীকার করা হয়।

পশু কোরবানি করার পর, হজ্জের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল মাথার চুল কামানো বা ছাঁটা। সকল পুরুষ হজ্জযাত্রীরা তাদের মাথা ন্যাড়া করেন বা তাদের চুল ছাঁটাই করেন এবং মহিলা হজ্জযাত্রীরা তাদের চুলের প্রান্ত কাটেন।

তাওয়াফে জিয়ারত ও সাঈ:

হজ্জযাত্রীরা হজ্জের অপরিহার্য অংশ তাওয়াফ আল-ইফাদাহ নামে পরিচিত। আরেকটি তাওয়াফের জন্য
মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে জিয়ারত (ফরজ তাওয়াফ) ও সাঈ সম্পন্ন করা।

১১-১৩ জিলহজ্জ:
১১-১৩ জিলহজ্জ সবগুলো জামারায় (ছোট, মধ্যম, বড়) ৭টি করে কঙ্কর মারা হয়।

বিদায়ী তাওয়াফ:
বিদায়ী তাওয়াফ হলো একটি ইসলামী আচার, যা মক্কা শরীফে পবিত্র কাবা ঘরের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত হজ্জ বা উমরাহ সম্পন্ন করার পর মক্কা ত্যাগ করার আগে পালন করা হয়।

সুতরাং, হজ্জ হলো আত্মশুদ্ধি, সাম্য ও একত্ববাদের মহান শিক্ষা।
আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে হজ্জ পালনের তাওফিক দান করুন,আমীন।

আল-কুরআন ও হাদিস:
ইসলামি জীবনদর্শনের মূলভিত্তি আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস।
আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়ত ও রহমত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাজিল করেছেন।
আর নবি করিম (সা.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর তা'আলার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। (রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর

বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদিস।) হাদিস আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

আল কুরআন:
কুরআন আরবি শব্দ। এর অর্থ পড়া, তিলাওয়াত করা, আবৃত্তি করা। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত হয় বিধায় কুরআনকে কুরআন বলা হয়।

ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস হলো আল-কুরআন। এটি শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের মূলভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা আল কুরআনে বিদ্যমান। এসব মৌলিক নীতিমালার আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।' (সূরা আন নাহল: ৮৯)

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর এ কিতাব নাযিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

কুরআন মাজিদ সহজ ও সাবলিল ভাষায় নাযিলকৃত। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল কুরআন অবতরণ:

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসের ২৭ তারিখ লাইলাতুল কদর বা মহিমান্বিত রাতে কুরআন মাজিদ নাযিল করা শুরু করেন। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এটি লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْآن مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ

অর্থ: 'বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (সূরা আল বুরুজ: ২১-২২)

আল কুরআন আল্লাহর বাণী যা তিনি আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। কারণ, আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ভাষা ছিলো আরবি।তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমন্ত্র থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন অনুসারে আল কুরআনের-বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল করেন। কখনো ৫ আয়াত, কখনো ১০ আয়াত, কখনো আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনো একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাযিল হতো। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে আল কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব:

আল কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা নিজে আল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল হিজর: ৯)

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আল কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এ জন্য আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও

পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। পবিত্র কুরআন সেই প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত অগণিত হাফেযের মাধ্যমেও সংরক্ষিত আছে। কেউ ভুল করলে সাথে সাথে অন্যরা-এমনকি সালাত অবস্থায়ও সংশোধন করে দেন।

আল কুরআন সংকলন:
মহানবি (সা.) এর সময়ে আল কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পবিত্র কুরআনের ফজিলত:

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত।
কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকি? পরিমাণ হলো দশগুণ। (তিরমিযি)
পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন:

بسم الله الرحمن الرحيم (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) -এর মধ্যে **১৯**টি বর্ণ রয়েছে।কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (**১৯**×**১০**) = **১৯০**টি নেকি লাভ করবে।

কুরআন মাজিদ অধ্যায়নের নিয়মকানুন:

কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে তাজবিদ অনুসারে। আল কুরআনকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুযায়ী শুদ্ধ ও সুন্দররূপে পাঠ করাকে তাজবিদ বলে। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সূরা আল-মুযাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়। এতে অনেক সময় কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন: মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াকফ, গুন্নাহ ইত্যাদি।

মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা:

আল কুরআনুল কারিমে দুই ধরনের সূরার নাম রয়েছে (মাক্কি ও মাদানি সূরা) অবতরণের সময়কাল বিবেচনায় সূরাসমূহকে এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।যথা–

মাক্কি সূরার পরিচয়:

রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে যেসকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাক্কি সূরা বলে।।

মাক্কি সূরার সংখ্যা ৮৬ টি।

মাদানি সূরার পরিচয়:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর যে সকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেসকল সূরাকে মাদানি সূরা বলে।

মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি।

আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য:

কুরআন মাজিদ বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়াতের বাণী নিয়ে অবর্তীর্ণ হয়েছে। তাই এই কুরআনের রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার কারণে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা এখন আল কুরআনের সেই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসমূহ জানবো, যার মাধ্যমে এর মাহাত্ম্যও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পূর্বযুগের বিভিন্ন উম্মত তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি কিতাব এবং তাদের নবির শিক্ষা নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন করে নানারকম বিকৃতি ঘটিয়েছে। আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত। এটিকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থারূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সবকিছুরই মূলনীতি কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। (সুরা আন-নাহল: ৮৯)

আল-হাদিস:

হাদিস (حَدِيْثٌ) আরবি শব্দ। শব্দটি একবচন। হাদিসের শাব্দিক অর্থ হলো কথা, বাণী, কাজ, বার্তা, সংবাদ, খবর, বিবরণ ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মহানবির (সা.)-এর বাণী, কর্ম, কর্মের সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদিস বলে। অর্থাৎ নবি হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস।

হাদিসের গুরুত্ব:

ইসলামি জীবনদর্শনের মূলভিত্তি আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস। আল-কুরআনে জীবনবিধানের মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে এবং আল-হাদিসে সেই মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল-হাদিস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ ও নির্দেশনাবলির বিস্তারিত বিবরণ। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান রয়েছে হাদিসের মধ্যে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য হাদিস অপরিহার্য। মানব জাতিকে ন্যায়-নীতি, সত্য ও শান্তির পথে আনতে দিকনির্দেশনা দেয় হাদিস। মুসলমানদের জীবনে হাদিস অধ্যয়ন ও চর্চা খুবই জরুরি

শরিয়তের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব:

ইসলামি জীবন বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। পবিত্র কুরআন হলো ইসলামের মৌলিক ভিধি এবং হাদিসে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের নমুনা পাওয়া যায়। হাদিস আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিস হচ্ছে রাসুল (সা.)-এর জীবনলেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যেসব নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে হাদিসে। উদাহরণস্বরূপ। সালাত ও সাওমের কথা বলা যেতে পারে। কুরআন শরিফে বলা হয়েছে, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। হাদিসে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে, কখন সালাত পড়তে হবে এবং কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে কাকে দিতে হবে, কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা উঠে এসেছে। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-আচার। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান পাওয়া যায় হাদিসে। এ ছাড়া মানবাধিকার। প্রাণীর অধিকার, পরিবেশের সংরক্ষণসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্লেষ রয়েছে হাদিসে। এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যগত সকল প্রকারের নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে। সর্বোপরি মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে পরিচালন করার জন্য হাদিসের নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন।

হাদিসের প্রকারভেদ:

হাদিসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। মূল বক্তব্য, বর্ণনাকারীর সংখ্যা বিবেচনায় হাদিসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে।মূল বক্তব্য অনুসারে হাদিস তিন প্রকার। যথা- কওলি হাদিস, ফেলি হাদিস ও তাকরিরি হাদিস।

১. কওলি হাদিস: যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর নিজ বাণী বর্ণিত হয়েছে তাই কওলি হাদিস বা বাণীসূচক হাদিস।

২. ফে'লি হাদিস: যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কাজ, কর্ম, আচার-আচরণের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এমন ধরনের হাদিসকে ফে'লি হাদিস বা কর্মসূচক হাদিস বলে।

৩. তাকরিরি হাদিস: যে হাদিসে সাহাবিগণের কোনো কথা, কর্ম বা আচার-আচরণের প্রতি মহানবি (সা.)-এর মৌন সম্মতি বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল হাদিসকে তাকরিরি হাদিস বলে।

হাদিস গ্রন্থসমূহ–

সিহাহ সিত্তার পরিচয়:

সহিহ (صَحِيْحٌ) আরবি শব্দ যার অর্থ হলো বিশুদ্ধ বা নির্ভুল। বহুবচনে সিহাহ (صِحَاحٌ) আর সিত্তাহ (سِتَّةٌ) অর্থ হলো ছয়। অতএব সিহাহ সিত্তাহর শাব্দিক অর্থ হাদিসের ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। মহানবি (সা.)-এর হাদিস সংকলনের অসংখ্য গ্রন্থ থেকে সর্বোত্তম বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থকে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলে। এ ছয়খানা হাদিসগ্রন্থ হলো বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ।

১.বুখারি: ইমাম বুখারি (রহ.) ১৬ বছর সাধনা করে বিশ্ববিখ্যাত 'সহিহ আল বুখারি' গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁরই নামানুসারে সহিহ বুখারি নামকরণ করা হয়। ইমাম বুখারি (রহ.) তার সংগৃহীত ছয় লক্ষের অধিক হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৭৭৬১টি হাদিস সন্নিবেশ করেন। তিনি হাদিস সংগ্রহের সময় খুবই আন্তরিক ও সতর্ক ছিলেন। সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে হাদিস গ্রহণ করতেন না। তিনি হাদিস গ্রন্থসংকলন করার সময় রোজা রাখতেন, গোসল করতেন এবং দু'রাকাআত এস্তেখারা নামাজ আদায় করতেন। এ জন্যই বিশ্ব দরবারে 'বুখারি' সর্বোচ্চ প্রশংসিত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

২.মুসলিম: ইমাম মুসলিম (রহ.) ১৫ বছর পরিশ্রম করে 'সহিহ মুসলিম' সংকলন করেন। তাঁর নামানুসারে 'সহিহ মুসলিম' নামকরণ করা হয়। তিনি ৩ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪ হাজার হাদিস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেন।

৩.আবু দাউদ: ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান আবু দাউদ' নামকরণ করা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) ৫ লক্ষ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৪ হাজার ৮ শত হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন।

৪.নাসাঈ: ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান নাসাঈ' নামকরণ করা হয়। নাসাঈ শরিফে মোট ৪৪৮২টি হাদিস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৫.তিরমিযি: ইমাম তিরমিযি(রহ.) এর নামানুসারে জামে তিরমিযি নামকরণ করা হয়েছে। তিরমিযি শরিফে ৫ লক্ষ হাদিস থেকে বাছাইকৃত ১৬০০ হাদিস সন্নিবেশিত করেন।

৬.ইবনে মাজাহ: ইবনে মাজাহ(রহ.) এর নামানুসারে সুনান ইবনে মাজাহ নামকরণ করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ(রহ.) কয়েক লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র ৪ হাজার হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজিদের পরই হাদিসের স্থান। শরিয়তের বিধান প্রবর্তন ও মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদিস অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উৎস।

কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ওহি। নামাযে কুরআন পাঠ করা হয়। হাদিস অপ্রকাশ্য ওহি। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কখনও মনগড়া কোনো কথা বলেননি। মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, কেবল তাই তিনি বলতেন। তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশনা পেয়েই তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে জানাতেন। মহান আল্লাহ বলেন,
'আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' (সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

হাদিস কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদিস ছাড়া কুরআন মেনে চলা অসম্ভব। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ শরিয়তের সকল আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে শরিয়তের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য মহানবি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদিস।

সুতরাং, আল-কুরআন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস। আর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। হাদিস কেবল রাসুল (সা.)-এর কথা ও কাজের বর্ণনা তা নয়, এটা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের সমষ্টি। তিনি ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মহান আল্লাহ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দান করেছেন। সেই জ্ঞান আমরা হাদিস শাস্ত্রেই খুঁজে পাই। পথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত হিদায়েতের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হলে হাদিসের

অনুসরণ করতে হবে। মহানবি (সা.) নিজে হাদিসের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

অর্থ: 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এগুলোকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা)

বস্তুত কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দু'টি উৎস। কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সত্য ও সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি হাদিসও সমস্ত মানবজাতিকে ন্যায় এবং শান্তির পথে পরিচালিত করে।
তাই কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমল ও নিজেদের জীবন গড়ে তুলবো।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা:

ইসলাম শুধু ইবাদত বা উপাসনার ধর্ম নয়; বরং এটি মানুষের চরিত্র গঠনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। একারণে ইসলামে নৈতিক শিক্ষা (আখলাক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রকৃত মুসলমান শুধু নামাজ, রোজা বা হজ পালনেই সীমাবদ্ধ থাকেন না; বরং তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা, লেনদেন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে।

আখলাক (اَلْأَخْلَاق) একটি আরবি পরিভাষা। এটি 'খুলুকুন' (خُلُق) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো- চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিক কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায়, মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাক বা চরিত্র।
শব্দগত দিক বিবেচনায় মানুষের ভালো ও মন্দ উভয় দিক মিলেই চরিত্র।

আখলাকের প্রকার:

মানুষের ভালো ও মন্দ দিক বিবেচনায় আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকার। যথা-

১. আখলাকে হামিদাহ তথা প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্র;

২. আখলাকে যামিমাহ তথা নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র):

আখলাক অর্থ হলো- চরিত্র বা স্বভাব। আর হামিদাহ শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। অতএব আখলাকে হামিদাহ অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ তথা প্রশংসনীয় চরিত্রের অপর নাম হলো আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র। মানুষের সামগ্রিক আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে উত্তম স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাকে হামিদাহ।

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র):

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র। মানুষের চরিত্রের খারাপ ও বর্জনীয় দিকগুলোই হলো আখলাকে যামিমাহ। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ক্রোধ, লোভ লালসা, পরনিন্দা, মানুষকে কষ্ট দেয়া প্রভৃতি আখলাকে যামিমাহ-এর উদাহরণ।

ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব:

চরিত্র মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। সাধারণত বিনয়, নম্রতা, সততা, ধৈর্য, ক্ষমা, তাকওয়া, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা করা, সৃষ্টির সেবা করা এগুলো মানুষের চরিত্রের উত্তম দিক। অপরদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, সুদ, ঘুষ, ক্রোধ, লোভ-লালসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া ও অসদাচরণ করা মানুষের চরিত্রের মন্দ দিক।

কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পৃথিবীর সকল নবি-রাসুল ও মহাপুরুষগণ মানবজাতিকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবি (সা.) কে মহান চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শই হলো প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে এ কথা ঘোষণা করে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ: 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব: ২১)

একারণেই মানুষকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে পাঠিয়েছেন। মহানবি (সা.) তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন: 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং, ইসলামে আখলাক শুধু বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং এটি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে সম্মানিত করে এবং আখিরাতেও সফলতা এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনী (সীরাহ) এবং কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ করাই হলো সঠিক আখলাক গঠনের উপায়।

ইসলামের প্রধান নৈতিক গুণাবলি:

ইসলাম যে গুণগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে, তা ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ তুলে ধরা হলো:

১.সত্যবাদিতা: সত্যবাদিতা অর্থ হলো সত্য কথা বলা, বাস্তবতা মেনে চলা এবং মন, মুখ ও কাজে সৎ থাকা। একজন সত্যবাদী ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলেন না, প্রতারণা করেন না এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করেন না।

ইসলামে সত্যবাদিতার গুরুত্ব:
ইসলামে সত্যবাদিতা একটি মৌলিক নৈতিক গুণ। কুরআন ও হাদিসে বারবার সত্যবাদী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত– হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে হও। (সূরা তাওবা: ১১৯)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সত্য বলো, কেননা সত্য কল্যাণের দিকে導 করে, আর কল্যাণ জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। (বুখারি ও মুসলিম)

সত্যবাদিতার উপকারিতা:
১. মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জিত হয়।
২. চরিত্র গঠন দৃঢ় হয়।
৩. সমাজে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪. আত্মিক শান্তি লাভ হয়।
৫. আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সত্যবাদিতা শুধু একটি গুণ নয়, বরং একজন মুসলমানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন সত্যিকারের মুমিন কখনোই মিথ্যা বলেন না, কারণ তিনি জানেন আল্লাহ সব দেখেন এবং বিচার করবেন। তাই আমাদের উচিত সবসময় সত্য কথা বলা ও সততার সঙ্গে জীবনযাপন করা।

২.ধৈর্য (সবর):
ধৈর্য বা সবর অর্থ হলো কষ্ট, দুঃখ, বিপদ বা প্রতিকূল অবস্থায় স্থির থাকা, নিজের ক্ষোভ, রাগ, এবং অভিযোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পরিস্থিতি সহ্য করা। ইসলামে ধৈর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ এবং ঈমানের অর্ধেক বলা হয়।

ইসলামে ধৈর্যের গুরুত্ব:
ধৈর্য আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। কুরআনে বহু স্থানে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত– নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

ইসলামে ধৈর্যের উপকারিতা:
আল্লাহর ভালোবাসা ও রহমত লাভ হয়।বিপদের মধ্যে শান্তি ও সাহস জোগায়।সমাজে একজন সহনশীল ও সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়।জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে ধৈর্যশীলদের জন্য।

ধৈর্য মুসলমানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা তাকে জীবনের নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। দুঃসময়ে হতাশ না হয়ে, ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাই মুমিনের পরিচয়। তাই আমাদের জীবনে ধৈর্য ধারণ করা উচিত এবং তা অন্যদেরও শেখানো উচিত।

৩.ক্ষমাশীলতা:

ক্ষমাশীলতা হলো— কারো দ্বারা কষ্ট, অপমান বা অন্যায় পেলেও প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। ইসলামে এটি একটি মহান নৈতিক গুণ, যা আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাদের শেখান এবং ভালোবাসেন।

ইসলামে ক্ষমাশীলতার গুরুত্ব:

ইসলাম শান্তি, সহনশীলতা এবং মানবতাকে গুরুত্ব দেয়। তাই ক্ষমা করা শুধু একটি গুণ নয়, বরং এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত– যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তুমি যদি চাও, আল্লাহ যেন তোমার প্রতি দয়া করেন, তবে তুমি আল্লাহর সৃষ্টি – মানুষদের প্রতিও দয়া ও ক্ষমাশীল হও।"

ক্ষমাশীলতার উপকারিতা:

১. মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়।
২. পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হয়।
৩. সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় থাকে।
৪. আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।
৫. নিজের অন্তর শান্ত ও হালকা হয়।

ক্ষমাশীলতা একটি মহৎ গুণ, যা ব্যক্তি ও সমাজ— উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সম্প্রীতি আনে। আমরা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে চাই, তাহলে আমাদেরও উচিত অন্যকে ক্ষমা করে দেওয়া।

৪.বিনয় বা নম্রতা:

বিনয় বা নম্রতা হলো নিজের আচরণ, কথা ও মনোভাবে বিনীত ও শালীন থাকা। অহংকার না করা, বড়াই না করা এবং নিজের যোগ্যতা বা সম্পদের গর্ব না দেখানোই বিনয়ের মূল বৈশিষ্ট্য। ইসলাম একজন মুসলমানকে বিনয়ী ও নম্র হতে শিক্ষা দেয়।

ইসলামে বিনয়ের গুরুত্ব:

ইসলামে বিনয় একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং অহংকার একটি গুরুতর পাপ। কুরআন ও হাদিসে অহংকারের নিন্দা এবং বিনয়ের প্রশংসা বারবার এসেছে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত– তুমি দম্ভভরে মানুষের কাছে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং জমিনে অহংকারভরে চলাফেরা করো না। (সূরা লুকমান: ১৮)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে সম্মান ও মর্যাদায় উন্নীত করেন। (মুসলিম)

বিনয়ের উপকারিতা:

১. মানুষকে সম্মানিত করে তোলে।

২. সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

৩. অহংকার ও হিংসা দূর হয়।

৪. মানুষ সহজে গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় হয়ে ওঠে।

৫. আল্লাহর নিকট প্রিয় বান্দা হওয়া যায়।

বিনয় মানুষকে প্রকৃত অর্থে মহান করে তোলে। যারা বিনয়ী, তারা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং মানুষের চোখেও সম্মানিত। তাই আমাদের উচিত সবসময় নম্রতা বজায় রাখা এবং অহংকার থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৫.ন্যায়পরায়ণতা:

ন্যায়পরায়ণতা বা ইনসাফ অর্থ হলো— সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থাকা, সঠিক বিচার করা এবং সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করা। ইসলামে ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে সমাজ গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষপাতিত্ব, জুলুম, অবিচার ইত্যাদি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার গুরুত্ব:

ন্যায়পরায়ণতা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি। কুরআন ও হাদিসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ বহুবার এসেছে যদি সেটা নিজের বা আপনজনদের বিপক্ষে হয়।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, বাবা-মা অথবা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। (সূরা নিসা: ১৩৫)

পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত– আল্লাহ সুবিচার করতে এবং সদাচরণ করতে আদেশ দেন। (সূরা নাহল: ৯০)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: ন্যায়পরায়ণ শাসক কিয়ামতের দিনে আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ন্যায়পরায়ণতার উপকারিতা:
১. সমাজে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান গড়ে ওঠে।
৩. জুলুম, হিংসা ও দুর্নীতি হ্রাস পায়।
৪. আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত লাভ করা যায়।
৫. একজন ব্যক্তির চরিত্র সুদৃঢ় হয় এবং সে সমাজে সম্মানিত হয়।

ন্যায়পরায়ণতা শুধু শাসকদের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পরিবার, বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র— সব জায়গায় ন্যায়বিচার চর্চা করা উচিত। ইসলাম যেহেতু শান্তির ধর্ম, তাই এর ভিত্তি হওয়া উচিত সত্য ও ন্যায়ের ওপর। একজন প্রকৃত মুসলমান সবসময় ইনসাফের পথেই চলেন।

৬.সহানুভূতি বা দয়া:
সহানুভূতি বা দয়া হলো অন্যের কষ্ট বুঝতে পারা, তাদের প্রতি মমতা ও স্নেহ দেখানো এবং সাহায্য করতে আগ্রহী হওয়া। দয়া মানব জীবনের এক মহান গুণ, যা মানুষকে কোমল, সহনশীল ও সহানুভূতিশীল করে তোলে।

ইসলামে সহানুভূতির গুরুত্ব:

সহানুভূতি ও দয়া ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় নৈতিক গুণগুলোর অন্যতম। আল্লাহ নিজেই সবচেয়ে দয়ালু (আর-রহমান, আর-রহিম) এবং তাঁর প্রিয় রাসুল (সা.)-কে “রহমাতুল্লিল আলামিন” অর্থাৎ “সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ার প্রতীক” হিসেবে প্রেরণ করেছেন।
আল-কুরআন বর্ণিত–
নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ। (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমরা দয়া করো যারা পৃথিবীতে আছে, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর দয়া করবেন। (তিরমিজি)

সহানুভূতির উপকারিতা:
মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা ও শান্তি সৃষ্টি হয়।সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও একতা গড়ে ওঠে।দয়ালু ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।গরিব-ধনীর বৈষম্য কমে যায়।আত্মিক প্রশান্তি পাওয়া যায়।

সহানুভূতি ও দয়া এমন একটি গুণ, যা মানবজীবনকে সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ করে তোলে। ইসলাম আমাদের শেখায়, আমরা যেন শুধু নিজের কথা না ভাবি, বরং অন্যের দুঃখ-কষ্টেও শরিক হই। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত নিজের জীবনে দয়া ও সহানুভূতির চর্চা করা।

৭.আত্মসংযম:
আত্মসংযম হলো নিজের খারাপ প্রবৃত্তি, লোভ, রাগ, ইচ্ছা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। যে ব্যক্তি নিজের আচরণ, কথা, চিন্তা ও কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সে আত্মসংযমী।
উদাহরণ: রাগের সময় ধৈর্য ধরা,
হারাম জিনিস থেকে নিজেকে দূরে রাখা,লোভ দেখেও অসৎ পথে না যাওয়া,ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করে রোজা পালন করা,প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করা।

ইসলামে আত্মসংযমের গুরুত্ব:
আত্মসংযম ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। কুরআন ও হাদিসে আত্মসংযমকে আল্লাহভীতির পরিচয় এবং জান্নাতের উপযুক্ত গুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
আল-কুরআনে বর্ণিত– যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে, জান্নাতই তার ঠিকানা। (সূরা আন-নাযিয়াত: ৪০–৪১)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রকৃত শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জয়লাভ করে, বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)

আত্মসংযমের উপকারিতা:
পাপ থেকে বাঁচা যায়। ব্যক্তিত্ব উন্নত হয়।মন শান্ত থাকে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। সমাজে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়।

আত্মসংযম একজন মুসলমানের ঈমান ও চরিত্রের পরিচয়। এটি না থাকলে মানুষ সহজেই অন্যায়, গুনাহ ও অপসংস্কৃতির পথে চলে যেতে পারে। তাই আমাদের উচিত নিজের প্রবৃত্তি ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে সংযমী জীবন যাপন করা।

৮.কৃতজ্ঞতা:
কৃতজ্ঞতা বা "শুকর" হলো আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নিয়ামত ও উপকারের জন্য অন্তর থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা এবং সেই নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করা। এটি শুধু মুখে "আলহামদুলিল্লাহ" বলায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং মন, মুখ ও কাজে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হলো আসল শুকর।

ইসলামে কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব:
ইসলামে কৃতজ্ঞতা একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ এসেছে বহুবার।
আল-কুরআনে বর্ণিত– যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদের আরও দান করব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। (সূরা ইবরাহিম: ৭)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। (তিরমিজি)

কৃতজ্ঞতার উপকারিতা:
আল্লাহর নিয়ামত আরও বৃদ্ধি পায়।মন শান্ত ও আত্মতুষ্ট হয়।ঈমান মজবুত হয়।মানুষের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো থাকে।অহংকার দূর হয়।

কৃতজ্ঞতা শুধু একটি ভালো গুণ নয়, বরং এটি একজন ঈমানদারের পরিচয়। আমরা যতই দুঃখ-কষ্টে থাকি না কেন, আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা ভেবে সব সময় কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা কৃতজ্ঞ মনেই থাকে সুখ, শান্তি ও আল্লাহর রহমত।

ইসলামের নৈতিক গুণাবলী মানুষের জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করে তোলে। এ গুণাবলী শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও জাতির উন্নয়নের জন্যও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানের উচিত এই গুণাবলিগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উত্তম আখলাক ও নৈতিক গুণাবলী অর্জনের তাওফিক দান করুন, আমীন।

অধিকারহারা মানুষের কল্যাণে ইসলাম:
ইসলামে অধিকারহারা মানুষের কল্যাণে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এটি শুধু নৈতিক উপদেশই নয়, বরং বাস্তব কর্মসূচি ও আইনি কাঠামোর মাধ্যমে দুর্বল, অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। ইসলাম সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–

وَ فِیۡۤ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الۡمَحۡرُوۡمِ

অর্থ:আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক। (সূরা আয-যারিয়াত :১৯)

মহানবী (সা.) যখন পৃথিবীর বুকে আগমন করেন তখন সাধারণ মানুষ ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকারহারা। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে মহানবী (স) মানুষের মধ্যে নিয়ে আসলেন সাম্যের বাণী এবং বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে তিনি প্রদর্শন করলেন এক ন্যায় এবং নীতির আদর্শ ইসলাম ।
ইসলামী সমাজে কেউ অনাহারে থাকতে পারে না এটিই রাসূল (ﷺ) এর ঘোষণা। মদিনার সনদে ইহুদি-মুশরিকসহ সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষিত ছিল। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের এই সামাজিক দর্শন প্রয়োগ করলে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন সম্ভব।

ইসলামে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার:
নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অন্যতম মহৎগুণ। মর্যাদার দিক থেকে নারী-পুরুষকে ইসলাম আলাদা করেনি। ইসলাম নারী জাতিকে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হলো নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ করা, তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা।

নারীর মর্যাদা বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। ইসলাম নারীকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।
ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সন্তানের কাছে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছে। একদিন জনৈক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বললেন, অতঃপর কে? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা। (বুখারি) এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের উপর পিতার চাইতেও মাতার অধিকার তিন গুণ বেশি। এটি মা হিসেবে নারীর অনন্য মর্যাদার পরিচায়ক।

কন্যা হিসেবেও নারীর মর্যাদা অপরিসীম। কন্যাদের ভালোভাবে প্রতিপালনের জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে।
মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মেয়ে শিশু বরকত (প্রাচুর্য) ও কল্যাণের প্রতীক'। হাদিসে আরও আছে, 'যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যা সন্তান থাকবে; আর সে ব্যক্তি যদি তার কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করে, তার জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যায়'। (তিরমিযি)

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'। (মুসলিম) তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। (তিরমিযি) স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা ও সম্মান স্বামীর অনুরূপ।
পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নারীদের ওপর যেমন অধিকার রয়েছে পুরুষের, তেমনি রয়েছে পুরুষের ওপর নারীর অধিকার'। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২২৮)

আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো

ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ'লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলামে দেশপ্রেম:

দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা মানুষের সহজাত স্বভাব। সকল ধর্মের লোকই তাদের দেশকে ভালোবাসে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এই ভালোবাসাকে ইসলাস কেবল সমর্থনই করে না; বরং একজন প্রকৃত মুমিনকে এগুলো ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাসুলকেই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছেন। মাতৃভূমি ও জন্মস্থানের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও আকর্ষণই হলো দেশপ্রেম। এ ভালোবাসা মানুষের অন্তর থেকে আসে। আজীবন মানুষ এ আকর্ষণ ও ভালোবাসা অনুভব করে।

দেশের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে। কারণ তিনিই আমাদেরকে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূখণ্ড দান করেছেন। যাঁরা স্বাধীনতা অর্জনে ত্যাগ ও অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানানো, তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা আমাদের কর্তব্য।

নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের সংবিধান, প্রচলিত আইন ও বিধি মেনে চলা, নিয়মিত 'কর' পরিশোধ করা এবং তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা। এছাড়াও ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা, নিজস্ব কৃষ্টি ও মূল্যবোধ চর্চা করা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হওয়া, সন্ত্রাস, হানাহানি, মারামারি ও বিশৃঙ্খলা না করা দেশপ্রেমের অংশ।

একজন প্রকৃত মুমিন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হয়ে থাকেন। তাই ইসলামের আলোকে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ মানুষকে স্বদেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। কেননা স্বদেশকে হেফাজত করতে না পারলে ধর্মকে হেফাজত করা যায় না।

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ইসলামি মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোনো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত রক্ষা করতে না পারলে মান-সম্মান, স্বাধিকার, ইমান ও আমল হেফাযত করা অসম্ভব। এজন্য ধর্মীয় দৃষ্টিতে। দেশপ্রেমের গুরুত্ব অত্যধিক।

জীবনে সফলতা অর্জন প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে। দেশপ্রেম সফলতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। মাতভূমি মানুষের জন্য শান্তির আশ্রয়। মাতৃভূমির পরশে যে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যায় তা অনন্য। সুতরাং আমরা দেশকে ভালোবাসবো এবং দেশের কল্যাণে অবদান রাখবো।

ইসলামে পরোপকার এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

পরোপকারকে আরবিতে ইহসান (ٌالْإِحْسَان) বলা হয়। এটি হসনুন (ٌحُسْن) মূলধাতু থেকে নির্গত। হুসনুন শব্দের অর্থ সুন্দর বা সৌন্দর্য। সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোনো কাজ সুন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করার নাম ইহসান। মোটকথা, সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইহসান বা পরোপকার বলা হয়।

ইহসান বা পরোপকার মহান আল্লাহর একটি গুণ। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যে তিনি এ গুণটির বিকাশ দেখতে পছন্দ করেন। পরোপকার মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।' (সুরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১০)

পরোপকার মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। পরোপকারী লোকদের আল্লাহ অধিক ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: 'আর তোমরা সৎকাজ ও পরোপকার করো, নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণ ও পরোপকারী লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

আল্লাহ আরও বলেন_

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: 'অবশ্যই আল্লাহ ইহসানকারী তথা পরোপকারীদের সাথে থাকেন।' (সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৯)

পরোপকার দ্বারা কেবল অন্যেরই কল্যাণ হয় তা নয়; বরং পরোপকারে নিজেরও কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ, পরোপকার করলে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যাদের উপকার করা হয় তারা কৃতজ্ঞ হয়। তার কোনো ক্ষতি করে না। ফলে তার জীবন নিরাপদ ও শান্তিময় হয়। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

অর্থ: তোমরা যদি অন্যের উপকার করো, তাহলে তা নিজেদেরই জন্য করলে, আর যদি অপকার করো, তাহলে তাও করবে নিজেদেরই জন্য।' (সূরা বনী ইসরাঈল :৭)

ইহসান তথা পরোপকারের দ্বারা সহজে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা হয়।

পরোপকার মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব মহামনীষী স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন পরহিতৈষী। আমাদের মহানবি (সা.) ছিলেন পরোপকারের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজে সব সময় মানুষের উপকার করতেন। অন্যকেও উপদেশ দিতেন মানুষের উপকার করতে। তিনি বলেন-'তোমরা দুনিয়ার অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করবেন।' (তিরমিযি)

ইসলামে সৃষ্টির সেবার গুরুত্ব:

সৃষ্টির সেবা করা একটি মহৎ গুণ। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির সেবাকে খিদমাতুল খালক বলা হয়।আরবি খিদমত শব্দের অর্থ সেবা করা আর খালক শব্দের অর্থ সৃষ্টি। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে সেবা-যত্ন, লালন-পালন, সংরক্ষণ ও সহায়তা করাকে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা বলে।

মানুষ যেমন মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, জড় ও অচেতন পদার্থ সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদাতের জন্য আর অন্যসব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

সৃষ্টির সেবা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সৃষ্টির সেবা করলে বা সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করলে মহান আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। তিনি তাদের দয়া করেন, অনুগ্রহ দান করেন। মহানবি (সা.) বলেন- তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (তিরমিযি)

সৃষ্টিকুলকে যে ভালোবাসে, আদর-যত্ন করে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকুলের প্রতি ভালোবাসার উপরই আল্লাহর ভালোবাসা নির্ভর করে। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহর পরিজন। জিন-ইনসান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এ সব নিয়ে মহান আল্লাহর এক বিশাল সৃষ্টি পরিবার। এসব সৃষ্টির লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা মানুষের কর্তব্য। এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ও তার প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। আর এ-সব সৃষ্টির প্রতি রূঢ় আচরণ ও দায়িত্ব পালন না করলে তিনি অখুশি হন। তাঁর ভালোবাসা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন- সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিজনের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল।' (বায়হাকি)

সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমেই যেমনি পরকালীন মুক্তি ও শান্তি লাভ করা সম্ভব তেমনি এর ওপরই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নির্ভর করে। মহানবি (সা.) আরো বলেন,

যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না। (বুখারি)

মোটকথা ইসলাম মানুষের সেবা ও খেদমতের জন্য, সমাজের উপকারের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবাদানের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আমরা সৃষ্টির সেবা করব। সৃষ্টিকুলের প্রতি সদয় আচরণ করব। কোনো জীব-জন্তুকে কষ্ট দেব না। পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হব।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম:

"ইসলাম" শব্দটি এসেছে আরবি "সালাম" থেকে, যার অর্থই হলো "শান্তি"। ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মূল বার্তাই হলো শান্তি, নিরাপত্তা, সহনশীলতা ও কল্যাণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামি শিক্ষা ও অনুশাসনের মূল উদ্দেশ্য।

ইসলামে শান্তির গুরুত্ব:
আল্লাহর অন্যতম নাম হলো "আস-সালাম" অর্থাৎ "শান্তির উৎস"। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন কামনা করেন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা শান্তি, ক্ষমা, ধৈর্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার করেছেন। তিনি কখনো জুলুম, হিংসা বা বিদ্বেষকে সমর্থন করেননি।
রাসুলুল্লাহ(সা.) বলেন, তোমরা সালাম প্রচার করো, মানুষকে খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজ পড়ো তাহলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিজি)
এ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ–
আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তার ঘরে ডেকে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ইউনুস: ২৫)

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা:
১. আত্মশুদ্ধি: নিজেকে অন্যায় থেকে দূরে রাখা
২. ন্যায়পরায়ণতা: সবার প্রতি সুবিচার করা
৩. ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা: অন্যের ভুল ক্ষমা করা
৪. সংঘাত ও হিংসা পরিহার: যুদ্ধ, মারামারি, বিদ্বেষ ও রক্তপাত বর্জন
৫. সামাজিক দায়িত্ববোধ: গরিব, অসহায় ও পীড়িতদের সাহায্য করা
৬. ভ্রাতৃত্ববোধ: মুসলিমদের মধ্যে এবং মুসলিম-অমুসলিম সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা

সুতরাং,ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ শান্তির ধর্ম। ইসলাম চায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও কল্যাণময় পরিবেশ গড়ে উঠুক। ইসলামী জীবনযাপন মানে হলো— নিজের ও অন্যের শান্তির জন্য কাজ করা।

পারিবারিক জীবনে ইসলাম:

ইসলামে পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়, আর একটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবার গঠনে ইসলামী শিক্ষা অপরিহার্য। ইসলামে পরিবার হলো মানব জীবনের প্রথম পাঠশালা, যেখানে একজন মানুষ নৈতিকতা, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও সহনশীলতা শিখে। পারিবারিক বন্ধন শক্ত হলে সমাজও শক্ত হয়।

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা, দায়িত্ব ও পারস্পরিক সম্মানের উপর ভিত্তি করে গঠিত।
পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) তোমাদের মধ্য থেকে জীবনসঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। (সূরা রূম: ২১)

ইসলামে পিতা-মাতাকে যথাযথ সম্মান ও সেবা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত–
তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সূরা ইসরা: ২৩)

ইসলাম শিশুকে জন্মের পূর্ব থেকেই অধিকার দিয়েছে। শিশুর ভালো নাম রাখা। শিক্ষা ও আদব দেওয়া। হালাল খাদ্য ও পোষাক দেওয়া। ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শিক পরিবেশে লালন পালন করা।

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মীয়ের খোঁজ-খবর রাখা।প্রয়োজনে সাহায্য করা। সম্পর্ক ছিন্ন না করা
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, আল্লাহ তার রিজিক বৃদ্ধি করেন ও আয়ু বাড়িয়ে দেন। (বুখারি)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার ফযীলত সত্যিই অনেক। যা দুনিয়া ও আখিরাত তথা উভয় জাহানের কল্যাণকেই শামিল করে এবং যা কুর'আন-হাদীস ও বিজ্ঞজনদের কথায় পরিব্যাপ্ত।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। তাই ইসলাম পরিবারের সংশোধন ও শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার বিশেষ দিক ও সৌন্দর্যগুলো আমাদের মধ্যে ফুটে উঠার তাওফিক দান করুন, আমীন।

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম:

দৈনন্দিন জীবনেও ইসলাম বলতে বোঝায়, একজন মুসলমান তাঁর প্রতিদিনের জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করবে। যা ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের জন্য নির্দেশনা দেয়।

ঘুম থেকে জাগরণ পর্যন্ত ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে।

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার সময়ই একজন মুসলমান "আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা..." বলে আল্লাহর প্রশংসা করে দিনটি শুরু করা। পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে ওযু করে ফজরের নামাজ আদায় করা। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ একজন মুসলমানকে নিয়ম ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়। খাদ্য গ্রহণেও ইসলাম খাওয়ার আদব রয়েছে যা খাওয়ার আগে হাত ধোয়া, 'বিসমিল্লাহ' বলা, ডান হাতে খাওয়া এবং খাওয়া শেষে আল্লাহর শোকর আদায় করা। এভাবে সাধারণ একটি কাজও ইবাদতের রূপ নেয়।

ইসলাম শিক্ষা দেয় পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে, বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকতে, স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসা ও দায়িত্ব নিয়ে দেখা-শুনা করতে। প্রতিবেশীর হক আদায় করাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

একজন মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও ইসলামের নির্দেশ মেনে চলবে। মাপজোখে কম না দেওয়া, সুদ বর্জন, প্রতারণা না করা এগুলো ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বলেছেন, "সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবে।"

ইসলাম অলসতা নিরুৎসাহিত করে। প্রতিদিন ফজরের পর কাজ শুরু করা, সময়ের অপচয় না করা, প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো একজন মুসলমানের দায়িত্ব।
ইসলাম পরিবেশ সংরক্ষণকে উৎসাহিত করে। বৃক্ষরোপণ, পানি অপচয় না করা, পশুপাখির প্রতি দয়াশীল হওয়াও ইসলামের শিক্ষা।
রাসূল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি একটি গাছ লাগায় বা ফসল করে, তা থেকে পাখি, মানুষ বা প্রাণী যাই খায়, তাতে সে সওয়াব পায়।"

অতএব, একজন মুসলমান যদি তার প্রতিদিনের কাজগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করে, তাহলে প্রতিটি কাজই তার জন্য ইবাদতে পরিণত হয়। ইসলাম কেবল মসজিদের মাঝে আবদ্ধ নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আলো ছড়িয়ে দেয়। তাই আমাদের উচিত, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করা, যাতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

ইসলাম ও আমাদের জীবন:

ইসলাম ও আমাদের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।দ্বীন ইসলামের প্রকৃতির সাথে মানব কল্যাণের ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পথহারা শান্তিহারা মানবজাতিকে ইসলামের কল্যাণের ছায়াতলে আহ্বান করেছেন।
অর্থাৎ ইসলাম একটি সার্বজনীন ও শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যার মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণ সাধন। এই ধর্মের প্রতিটি শিক্ষা ও নির্দেশনা মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে দেওয়া হয়েছে। ইসলামে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং তাদের মধ্যে সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে ধনী-গরিব, জাতি-বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণিভেদ না করে ইসলাম মানুষকে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বলে। দান-সদকা, যাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশনা ইসলাম বারবার দিয়েছে। এতে করে সমাজে সাম্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মানবকল্যাণের অন্যতম ভিত্তি।পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার মানবকল্যাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামে সৎকর্ম, সদাচরণ, গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা পরিহার, এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এসব মানবিক গুণাবলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি পশু-পাখির প্রতিও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ

দিয়েছে ইসলাম। রোগী দেখতে যাওয়া, অনাথের সাহায্য করা, প্রতিবেশীর খোঁজ রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে মানবতার উন্নয়ন সম্ভব এবিষয়ে ইসলাম স্পষ্ট ও দৃঢ় বার্তা দেয়।

অতএব,ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করলে ব্যক্তিগত শান্তি ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। ইসলামের সত্যিকার অনুসরণই মানবজাতিকে শোষণ, অশান্তি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে একটি সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারে।

ইসলাম শুধু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবকল্যাণের এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সামগ্রিক সমাজের উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের কল্যাণ সাধন ও একটি মানবিক সমাজ গঠন। কুরআন ও হাদিসের আলোকে জীবন গঠন করাই মুমিনের লক্ষ্য, যাতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সফল হয়।